# ৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

## আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

**লেকচার: ০৭+০৮**

**টপিক:**

- ✓ **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রধান সমস্যা ও সংঘাত:** মধ্যপ্রাচ্য সংকট (জেরুজালেম, ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেন, কুর্দিস্তান, সৌদি-ইরান সংঘাত)
- ✓ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রধান সমস্যা ও সংঘাত:** (i) মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান (ii) আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট (iii) ভূমধ্যসাগর সংকট (iv) বাণিজ্য যুদ্ধ এবং সামসময়িক ইস্যু।
- ✓ **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ:** বড় অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা (১৯৭১-২০২১), বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি, সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি), উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

# মধ্যপ্রাচ্য সংকট

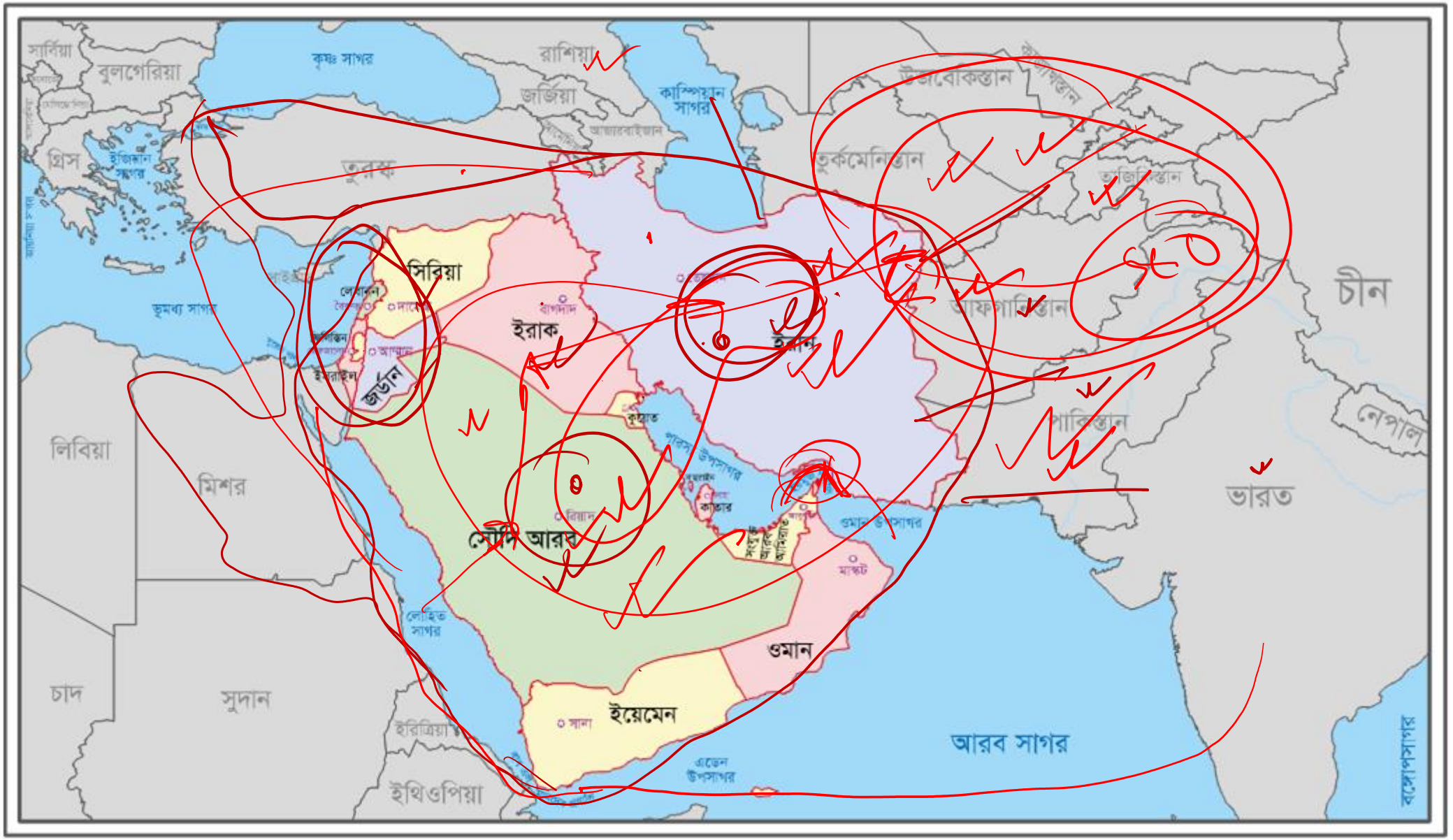



সার্বিয়া
বুলগেরিয়া
কৃষ্ণ সাগর
রাশিয়া
জর্জিয়া
কাস্পিয়ান সাগর
আজারবাইজান
উজবেকিস্তান
তুর্কমেনিস্তান
তাজিকিস্তান
গ্রিস
ইজিয়ান সাগর
তুরস্ক
সিরিয়া
ভূমধ্য সাগর
বাগদাদ
ইরাক
ইরান
আফগানিস্তান
চীন
লেবানন
দামেস্ক
আম্মান
ইসরাইল
জর্ডান
কুয়েত
পাকিস্তান
নেপাল
লিবিয়া
মিশর
কাতার
রিয়াদ
সৌদি আরব
ভারত
ওমান উপসাগর
মাস্কট
লোহিত সাগর
ওমান
চাদ
সুদান
ইরিত্রিয়া
সানা
ইয়েমেন
আরব সাগর
এডেন উপসাগর
ইথিওপিয়া
বঙ্গোপসাগর

# জেরুজালেম সংকট

ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম-এই তিনটি ধর্মেরই পবিত্র স্থান বর্তমান জেরুজালেম তথা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডটি। তাই এসব ধর্মাবলম্বীদের নিকট এর একটি আলাদা মর্যাদা রয়েছে। পবিত্র আল-আকসা মসজিদের অবস্থান ও হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মেরাজ গমনের স্থান হিসেবে মুসলমানদের নিকট জেরুজালেমের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। অপরদিকে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে রয়েছে, ঈশ্বর স্বয়ং পথ দেখিয়ে আব্রাহামকে ফিলিস্তিনে নিয়ে এসেছেন এবং ফিলিস্তিনকে আব্রাহামের বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর থেকেই ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে ঈশ্বরের দান মনে করে এক মহাপুণ্যস্থান হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। এছাড়া ফিলিস্তিনে ইহুদি রাজা সলোমন কর্তৃক ধর্মমন্দির নির্মাণ ও যুগে যুগে বহু ইহুদি মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে ফিলিস্তিন ইহুদিদের নিকট ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিতাড়িত ইহুদিরা সংঘবদ্ধভাবে ফিলিস্তিনে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে। তারা ফিলিস্তিনের উপর তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দাবি উত্থাপন করে।

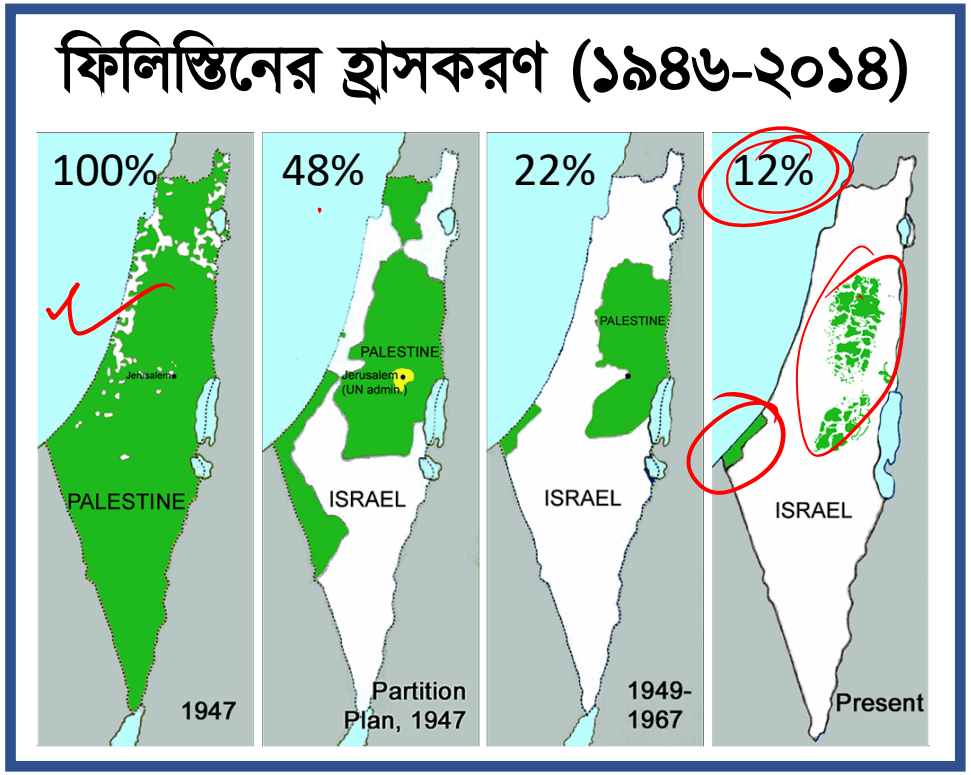


১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জেরুজালেম সংকটের সূচনা হয়েছিল। ফিলিস্তিনের উপর আরবদের দাবির ভিত্তি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক। কিন্তু ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে উভয় পক্ষের দাবিসমূহ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। কেননা ধর্মীয় পবিত্রতার মাত্রা নিরুপণ করা যায় না। বসবাস ও দখলদারিত্বের দিক থেকে আরবরা এগিয়ে থাকলেও শুধুমাত্র এর উপর ভিত্তি করে ইহুদিদের দাবিকে পুরোপুরি নাকচ করা যায় না। অন্যদিকে, কোনো স্থান থেকে বিতাড়িত হওয়ার প্রায় দুই হাজার বছর পর পুনরায় সেই স্থানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি বিশ্ব ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ফলে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব বিশ্বনেতাদের সামনে এক অভিনব সমস্যা হিসেবে হাজির হয় যা সমাধানে কোনো অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তাদের কাছে ছিল না।

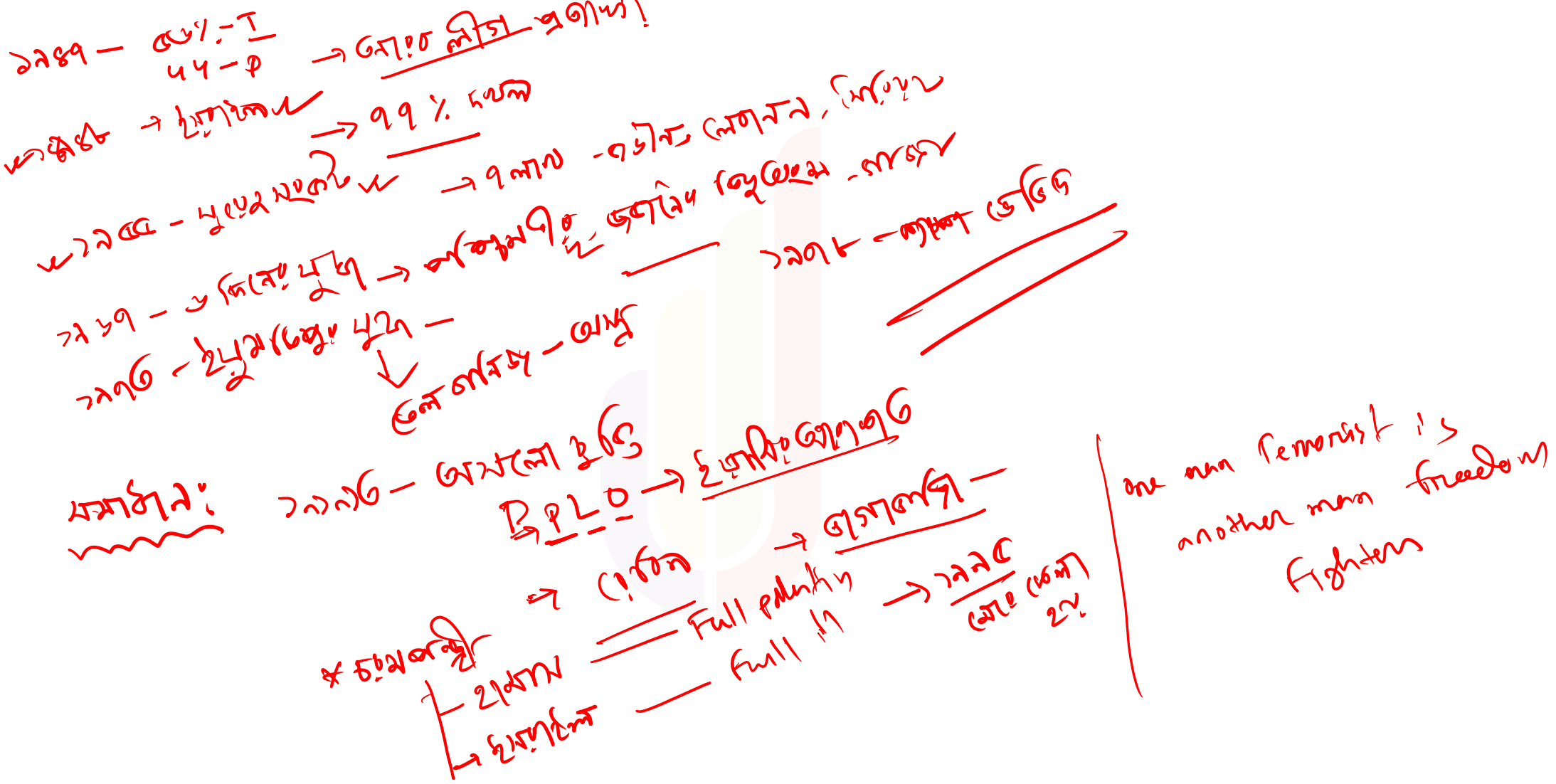

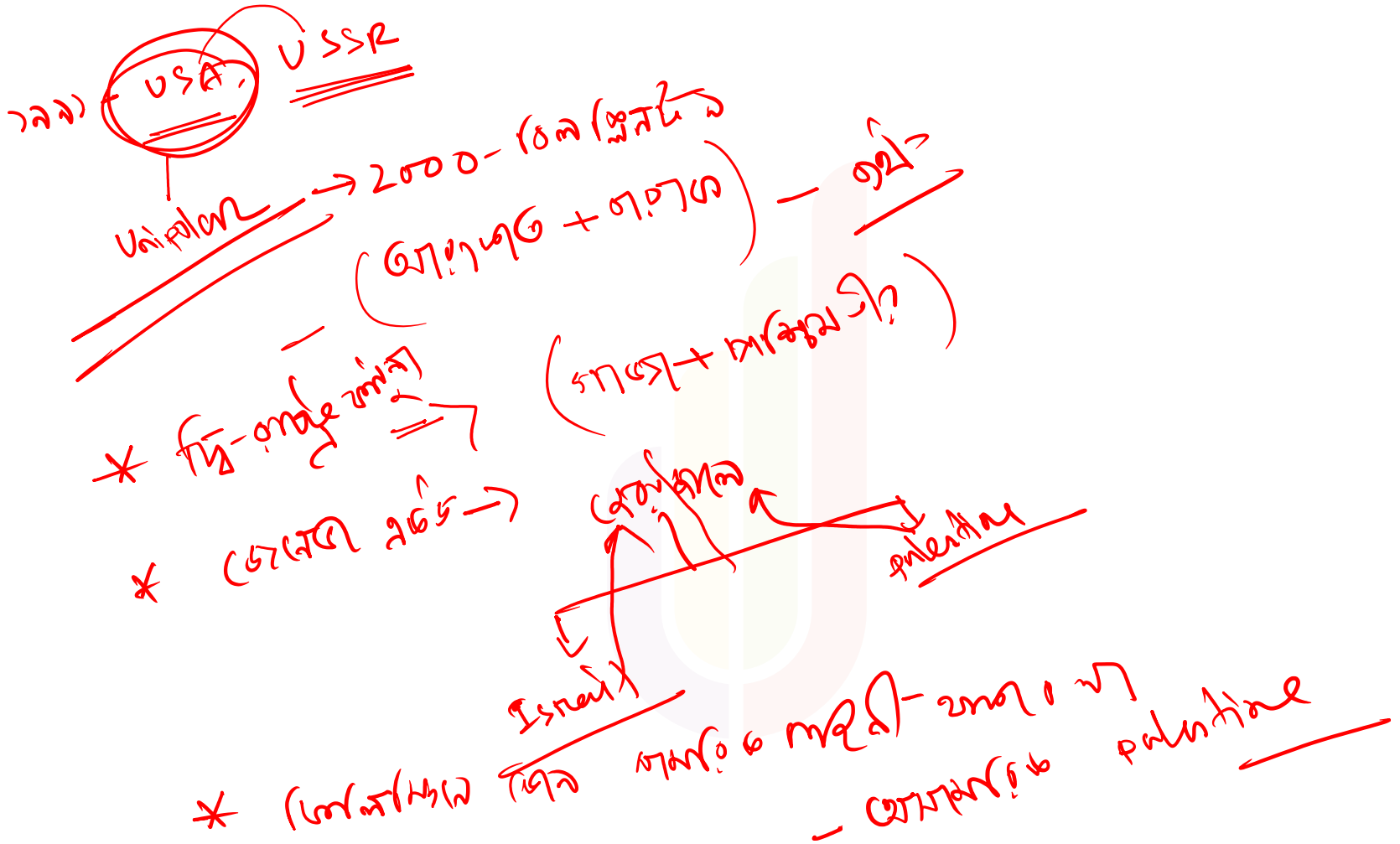

* গাজাসহ অধিকাংশ ফিলিস্তিনি ভূমি দখলে — নেতানিয়াহু

* হামাস — জেরুজালেম + পূর্ব সার্বভৌম

* জাতিসংঘ — স্বীকৃতি — দ্বি-রাষ্ট্র — নিরাপত্তা! নিরাপদ সমাধান

Donald Trump!

Deal of the century — 2020

i) পশ্চিম তীর ও গাজা ফিলিস্তিন

~~ii) হামাসের অস্ত্র জমা দিতে হবে~~

iii) জেরুজালেম হবে যৌথ রাজধানী (

~~iv) ফিলিস্তিন হবে অসামরিক~~

শুধু! ছল-চাতুরী দেওয়া সমাধানের নীল)

v)

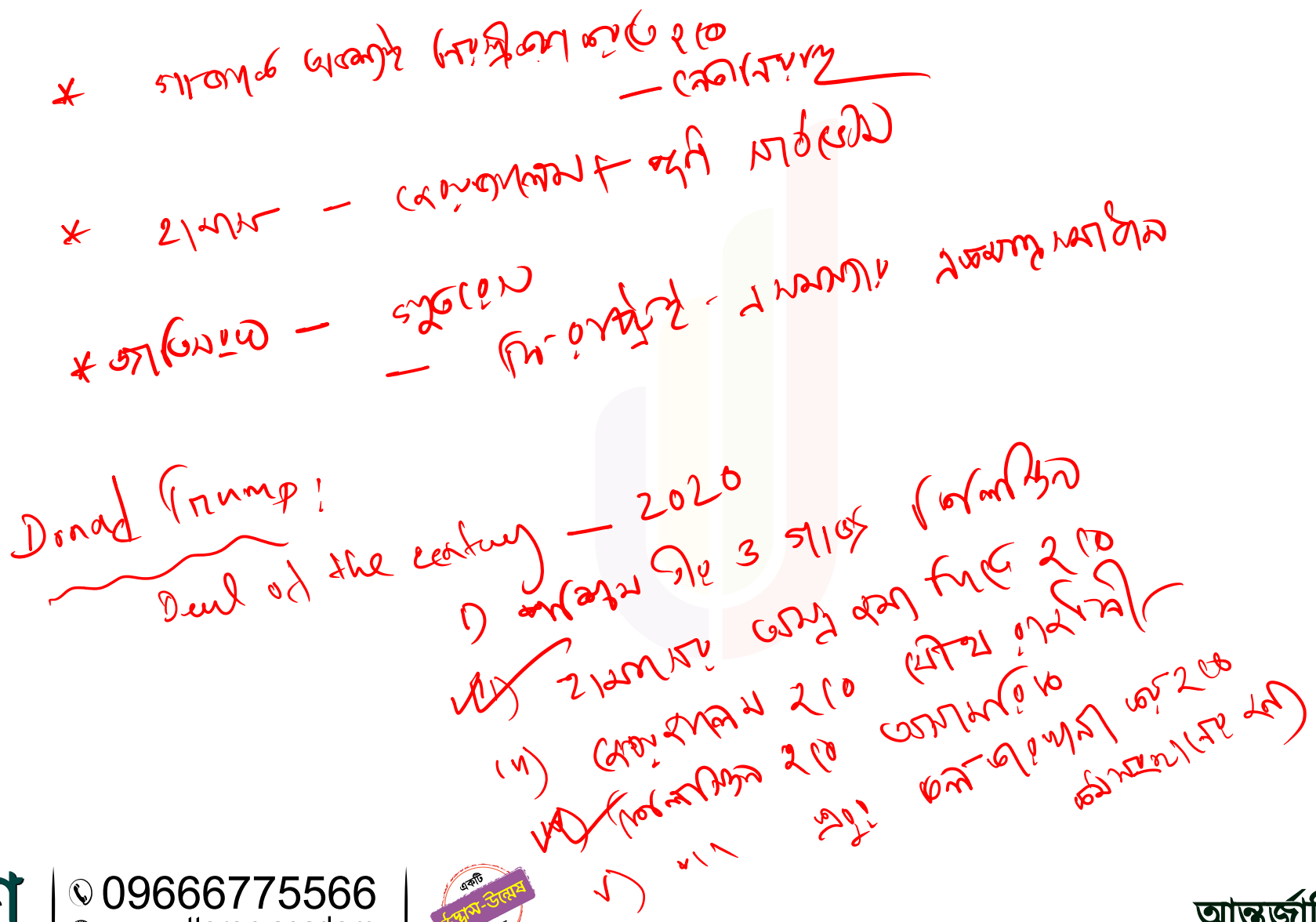

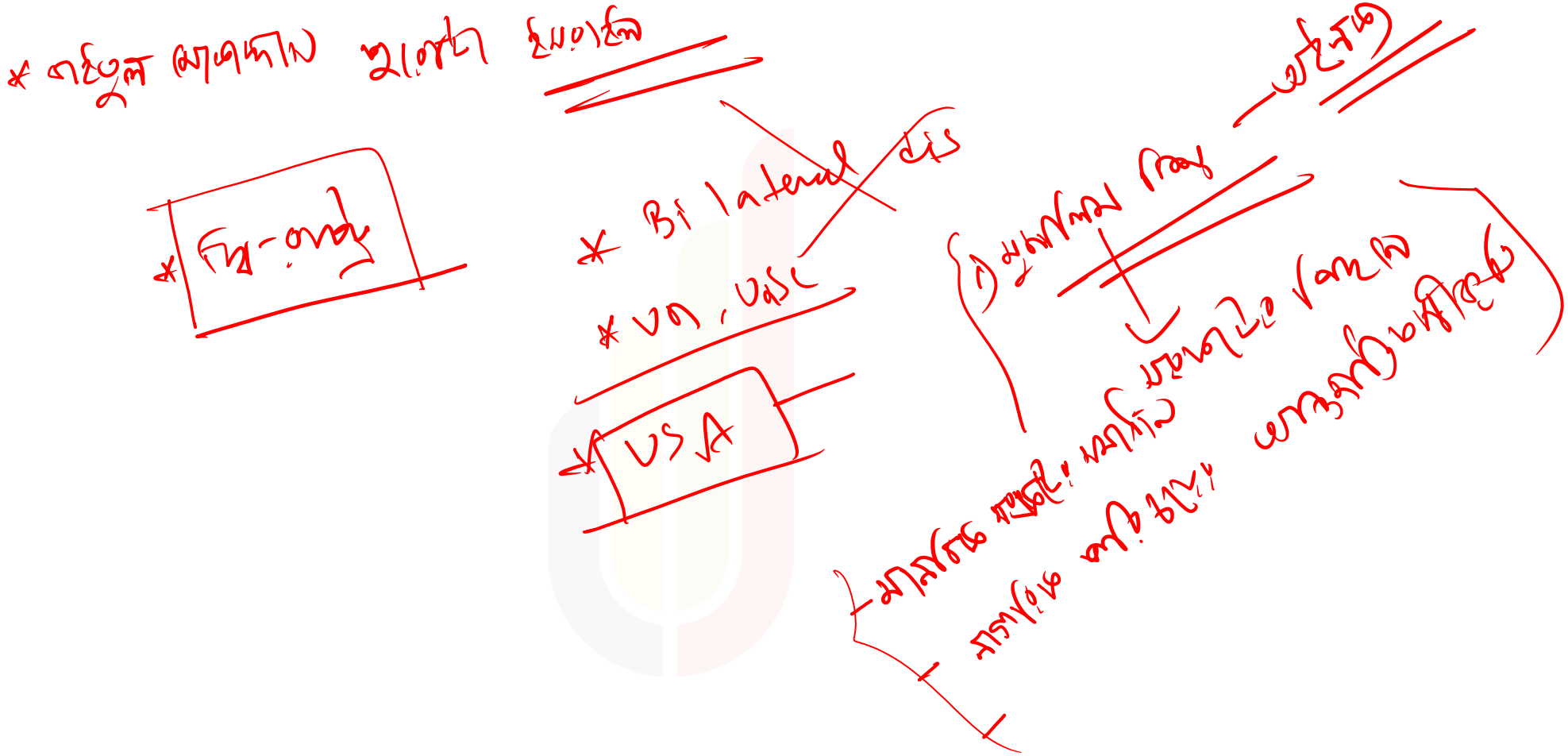

# জেরুজালেম সংকট

## ❑ শান্তি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১৯৭৩ সালে জেনেভায় শান্তি আলোচনার শুরু হয়। এর মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি।

- **ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি:** আরব অধ্যুষিত এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইসরায়েল ঐতিহাসিক ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে মিশর ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। এর মাধ্যমে মিশর সিনাই উপত্যকা ফিরে পায়। কিন্তু আরব দেশগুলোর সাথে মিশরের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

- **অসলো শান্তি চুক্তি:** তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ১৯৯৩ সালে Palastine Liberation Organization (PLO), [যা ১৯৮৮ সালে গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত হয়] ও ইসরায়েলের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে PLO ও ইসরায়েল একে অপরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত এলাকায় PLO এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

# জেরুজালেম সংকট

➢ **উই রিভার চুক্তি:** ১৯৯৮ সালে PLO প্রধান ইয়াসির আরাফাত ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তিও বলা হয়। তবে কট্টরপন্থি ইহুদিরা শুরু থেকেই এ চুক্তির বিরোধিতা করছে।

## ❑ ফিলিস্তিন অঞ্চলের বিভক্তি:

ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বর্তমানে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

✓ **Area-A:** এখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃত্ব রয়েছে যা মাত্র ১১ ভাগ এলাকা।

✓ **Area-B:** এর অন্তর্ভুক্ত ২৮ ভাগ এলাকা যেখানে কর্তৃত্ব রয়েছে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের যৌথ প্রশাসনের।

✓ **Area-C:** ৬১ ভাগ এলাকা, যেখানে ইসরায়েলি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০০৭ সালে হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মাঝে বিভক্তি আসে। হামাস ও ফাতাহ আলাদা আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে। ফাতাহ-হামাস দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়েছে ইসরায়েল।

# জেরুজালেম সংকট

## ❑ বর্তমান সংকট

উই রিভার চুক্তি স্বাক্ষরের পর কেটে গেছে ২৫ বছর। কিন্তু ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে থাকা এ সমস্যার আদৌ কোনো সমাধান হয়নি। শান্তি প্রস্তাব রয়ে গেছে কাগজে কলমে। ইসরায়েলের আগ্রাসী মনোভাব ও দখলিকৃত অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপন পরিস্থিতিকে বারবার জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত সাম্প্রতিক ঘটনা।

➢ **জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি:** ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর মাধ্যমে পশ্চিম তীর, গাজাসহ বিভিন্ন স্থানে ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ট্রাম্পের ঘোষণা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ফিলিস্তিনে আবারো নতুন করে ইন্তিফাদা শুরু হয় এবং সংকট নতুন আকার ধারণ করে।

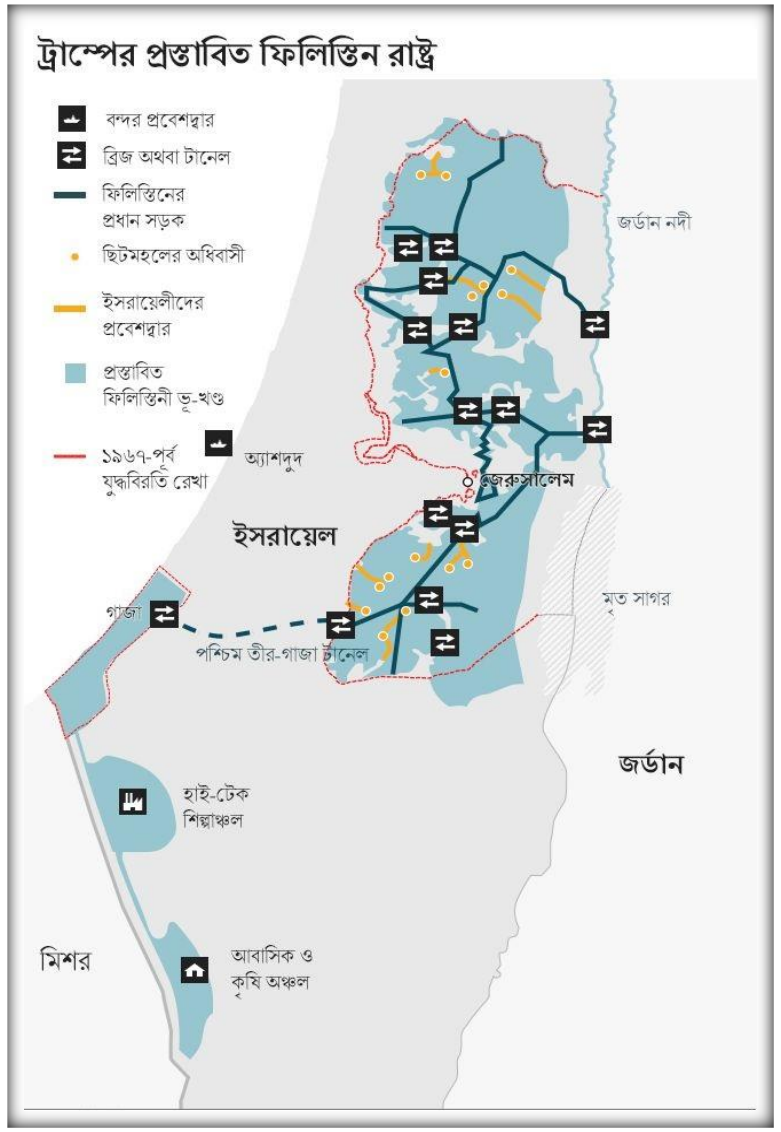

# জেরুজালেম সংকট

- **মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব হতে জেরুজালেমে স্থানান্তর:** ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৭ সালেই মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব হতে জেরুজালেমে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন ফলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। হামাস যুক্তরাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে।

- **ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি:** ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানে দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিন্তু বিগত ট্রাম্প প্রশাসন এ ফর্মুলাকে সমর্থন করেননি। উল্টো ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব বিলীনকারী ষড়যন্ত্রমূলক একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। এ চুক্তিটি ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি নামে ঘোষিত এবং এতে স্বাক্ষর করে ইসরায়েল ও মার্কিন প্রশাসন। এতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা অস্বীকার করা হয়। ফলে সংকট আরো ঘনীভূত হয়।

  আরব দেশগুলো এই চুক্তির পরিবর্তে সালভেশন অব দ্য সেঞ্চুরি নামক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এটি ফিলিস্তিনিদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদের উপর আরোপিত নির্যাতন নিপীড়নের অবসানকল্পে আরব দেশগুলোর গৃহীত একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মহাপরিকল্পনা।

# জেরুজালেম সংকট

- **আব্রাহাম অ্যাকর্ডস:** ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উপসাগরীয় দেশ হিসেবে আরব আমিরাত প্রথম দেশ, যে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কিছুদিন পর বাহরাইনও ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর আগে ১৯৭৯ সালে মিশর ও ১৯৯৪ সালে জর্ডান ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

  সৌদি আরব ও ওমান আরব আমিরাতের পথ অনুসরণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

  এ ধরনের চুক্তি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আরব বিশ্বের দীর্ঘদিনের শক্ত অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে।

- **হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ:** এপ্রিল ২০২১ সালে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রাতে জেরুজালেমে আল আকসা মসজিদের দামেস্ক গেট বন্ধ করায় ফিলিস্তিনি মুসলমানরা বিক্ষোভ করলে ইসরায়েলি পুলিশ হামলা করে। এ সময় ইসরায়েলি বাহিনী মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে মুসল্লিদের ওপর নির্যাতন চালায়। এরপর গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের সাথে ইসরায়েলের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। হামাস রকেট হামলা চালালে ইসরায়েল বিমান হামলা শুরু করে। ১১ দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও ইসরায়েল মাঝে মাঝে হামলা অব্যাহত রেখেছে। ২০ মে, ২০২১ যুদ্ধবিরতি হয়।

# জেরুজালেম সংকট

➢ **ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ (২০২৩):** হামাসের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি বড় আকারের আক্রমণ শুরু করে। হামাস একে অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড নামে অভিহিত করে। সংশ্লিষ্ট ইসরায়েলীয় প্রত্যাক্রমণকে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) দ্বারা অপারেশন আয়রন সোর্ডস নাম দেওয়া হয়।

| হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি | |
|---|---|
| ➢ **গাজা উপত্যকা:**<br>✓ ৩৭,৩৩৭+ নিহত<br>✓ ৮২,৭৭৭+ আহত<br>✓ ১০০০০+ নিখোঁজ<br><br>➢ **ইসরায়েলের অভ্যন্তরে:**<br>✓ ১,৬০৯+ ফিলিস্তিনি সশস্ত্র যোদ্ধা নিহত<br>✓ ২০০ জন ফিলিস্তিনি সশস্ত্র যোদ্ধা বন্দী<br><br>➢ **পশ্চিম তীর:**<br>✓ ৪৯২+ জন নিহত<br>✓ ৪৮০০+ আহত | ➢ **ইসরায়েল:**<br>✓ ১,৪৩৬+ নিহত<br>✓ ৮,৭৮৭+ আহত<br>✓ ২৫৩+ বন্দী<br>✓ ৭ জন নিখোঁজ<br><br>➢ **মিশর:**<br>✓ ৬ বেসামরিক নাগরিক আহত |

# জেরুজালেম সংকট

## ❑ সংকট সমাধান না হওয়ার কারণ

➢ **ইসরায়েলের একগুয়ে মনোভাব:** বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ইসরায়েলের একগুয়েমি ও আগ্রাসী মনোভাবের কারণে আজও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। বরং শান্তি প্রস্তাব কাগজে কলমেই রয়ে গেছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২, ৩৩৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরায়েলের অধিকৃত আরব এলাকা ফিরিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ইসরায়েল সেই সিদ্ধান্ত কখনো কার্যকর করেনি। ৪৭৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী জেরুজালেমে দূতাবাস স্থাপন বন্ধ করার কথা বলা হয় কিন্তু ইসরায়েল এসব মানেনি।

➢ **যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা:** ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের অন্যতম মিত্র ও সহযোগী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র। পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চায়নি ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হোক। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন সব সময় ইসরায়েলকে সমর্থন করে গেছে। জাতিসংঘে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, ইহুদিবাদ একটি বর্ণবাদ মতবাদ। ১৯৯২ সালে সেই প্রস্তাব বাতিল ঘোষণা করে আমেরিকা প্রশাসন জাতিসংঘে নতুন প্রস্তাব এনেছিল এবং জাতিসংঘে তা গৃহীতও হয়েছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আনীত ৭০টিরও বেশি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে। জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি ও যুক্তরাষ্ট্র তার দূতাবাস তেল আবিব হতে জেরুজালেমে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে।

# জেরুজালেম সংকট

- **জাতিসংঘের ভূমিকা:** ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ বিবৃতি দিয়েই তাদের দায় সেরেছে। জাতিসংঘ ইসরায়েলকে বাধ্য করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফিলিস্তিনে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম ইসরায়েল পরিচালনা করলেও জাতিসংঘ সেসব বন্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

- **ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি স্থাপন:** ইসরায়েলের আগ্রাসী মনোভাব ও দখলিকৃত অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপন পরিস্থিতিকে বারবার জটিলতার দিকে নিয়ে গেছে।

- **'দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা' ব্যর্থ:** ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সমস্যা সমাধানে দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা চলছিল। বিগত মার্কিন প্রশাসন এটিকে সমর্থন করলেও ট্রাম্প প্রশাসন এ ফর্মুলাকে সমর্থন করেনি। বরং ইসরায়েলের সাথে 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' নামক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ফলে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে।

- **আরব দেশগুলোর অন্তঃকোন্দল:** মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি আরব দেশই কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তঃকোন্দলে বিদ্যমান। ফলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলো সম্মিলিতভাবে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মিশর এবং ১৯৯৪ সালে জর্ডান ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আগস্ট ২০২০ এ ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর মধ্যে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ড' নামক শান্তি চুক্তি হয়। বাহরাইন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ফলে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে আরব দেশগুলোর এক ধরনের উদাসীন মনোভাব তৈরি হয়েছে এবং সংকটের সমাধান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

# জেরুজালেম সংকট

## ❑ সংকট সমাধানে করণীয়

- ✓ জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
- ✓ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ
- ✓ আরব দেশগুলোর বিভক্তি দূরীকরণ
- ✓ 'দুই রাষ্ট্র' নীতি কার্যকর করা
- ✓ ইসরায়েলের একগুয়ে মনোভাব বর্জন করা
- ✓ ইহুদি কর্তৃক অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধ করা
- ✓ প্রয়োজনে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

ফিলিস্তিন সংকট এমন এক সংকট, যার সূচনা প্রায় ৭৫ বছর আগে। পৃথিবীতে আর কোনো সমস্যা নেই, যার সাথে ফিলিস্তিন সমস্যা তুলনা করা যায়। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা চলে আসছে। কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় এ সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেননি। এ সংকটের মাত্রা ও গভীরতা এত বেশি যে পশ্চিমা পণ্ডিত অধ্যাপক হান্টিংটন এ সংকটকে কেন্দ্র করে তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব The Clash of Civilization বা সভ্যতার দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছেন।

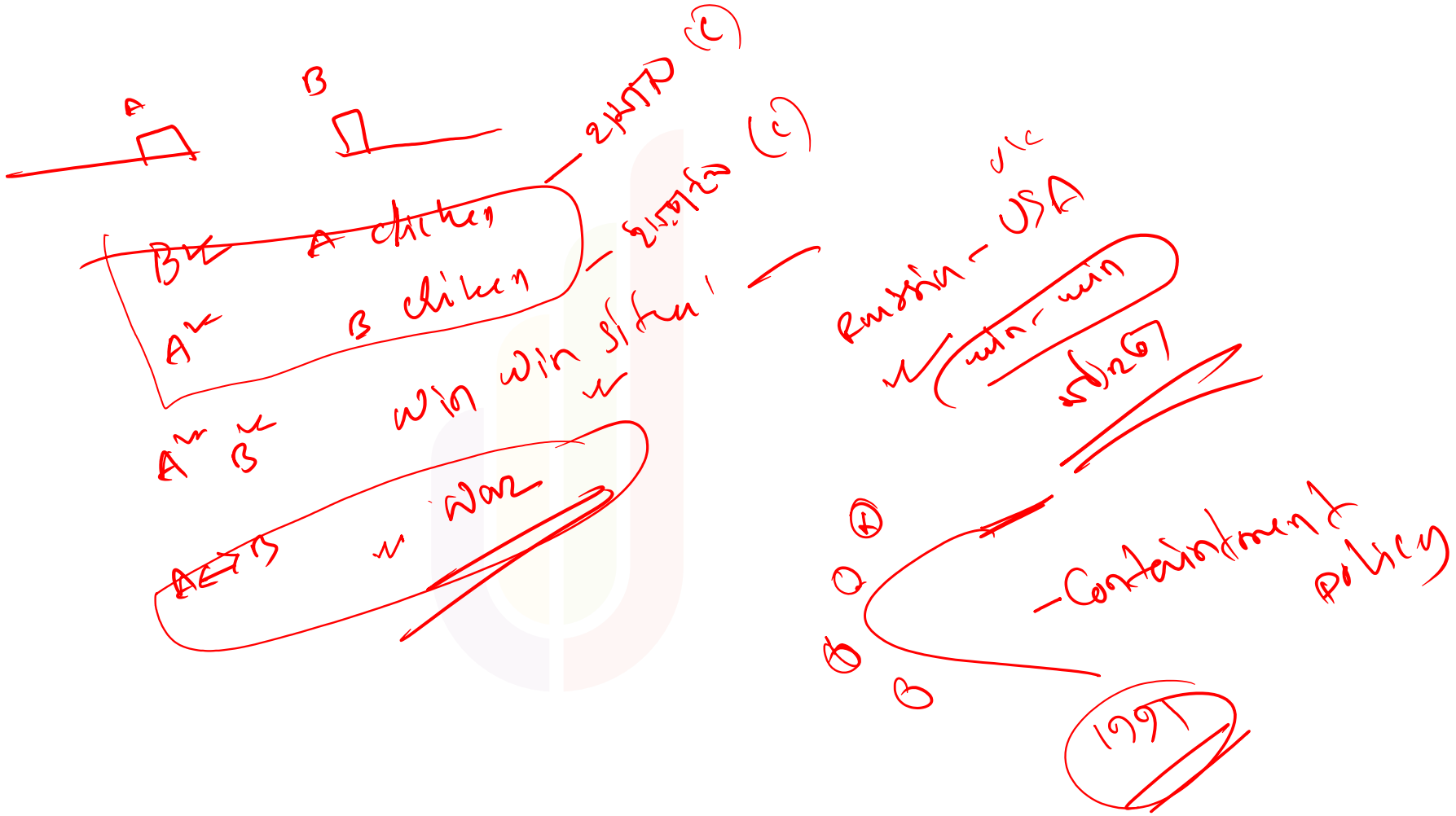

# ইরান সংকট

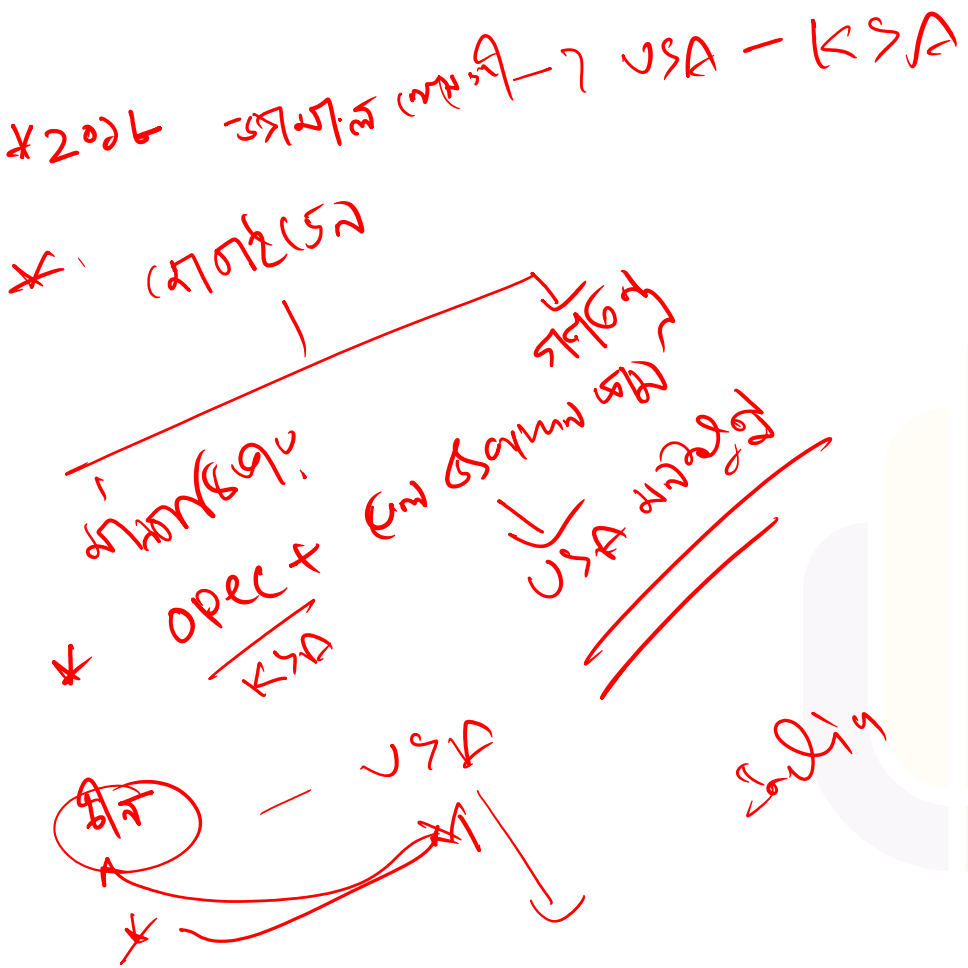

আজারবাইজান
কাস্পিয়ান সাগর
তুর্কমেনিস্তান
তেহরান
ইরান
ইরাক
আফগানিস্তান
কুয়েত
পারস্য উপসাগর
পাকিস্তান
সৌদি আরব
বাহরাইন
কাতার
সংযুক্ত আরব আমিরাত

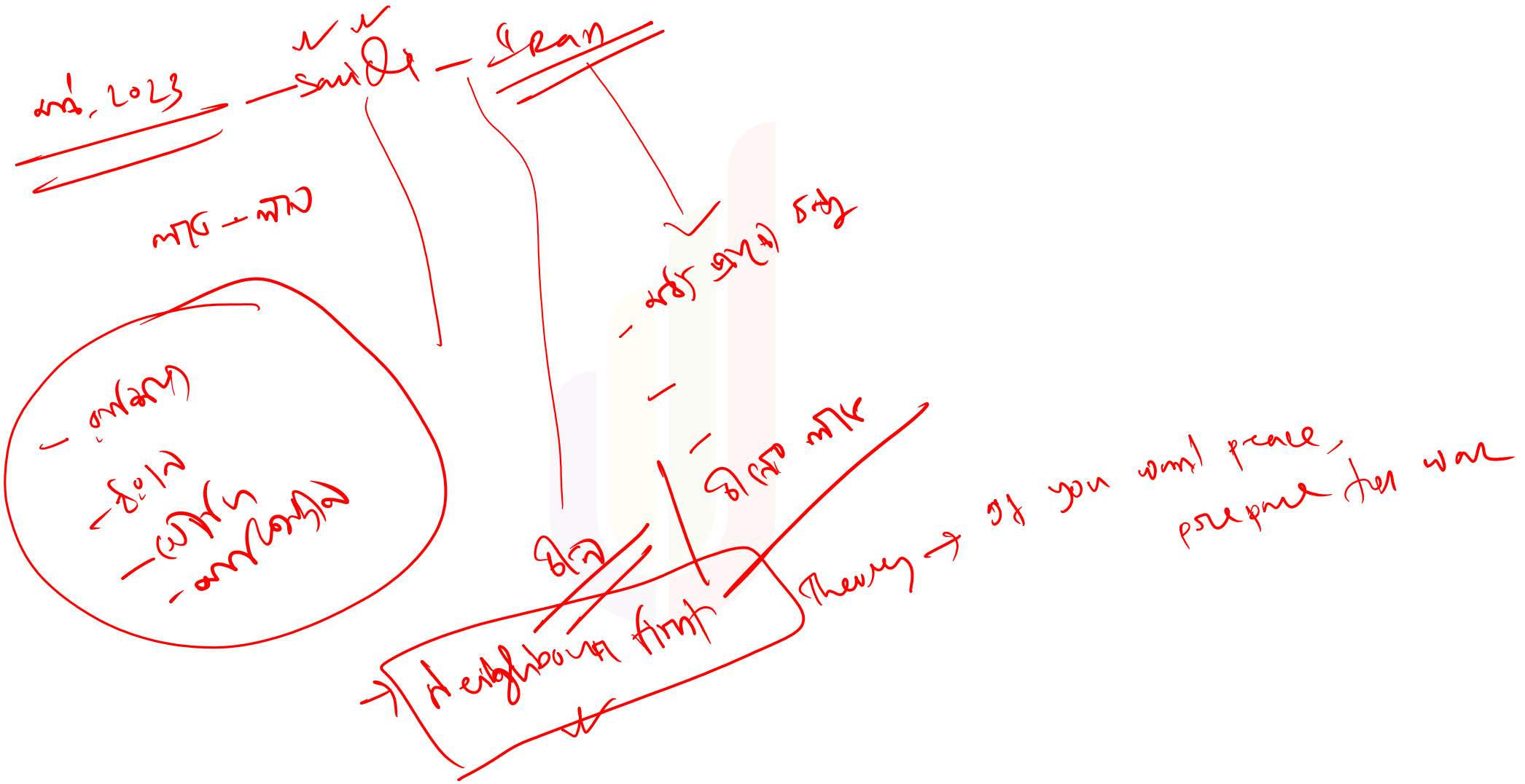

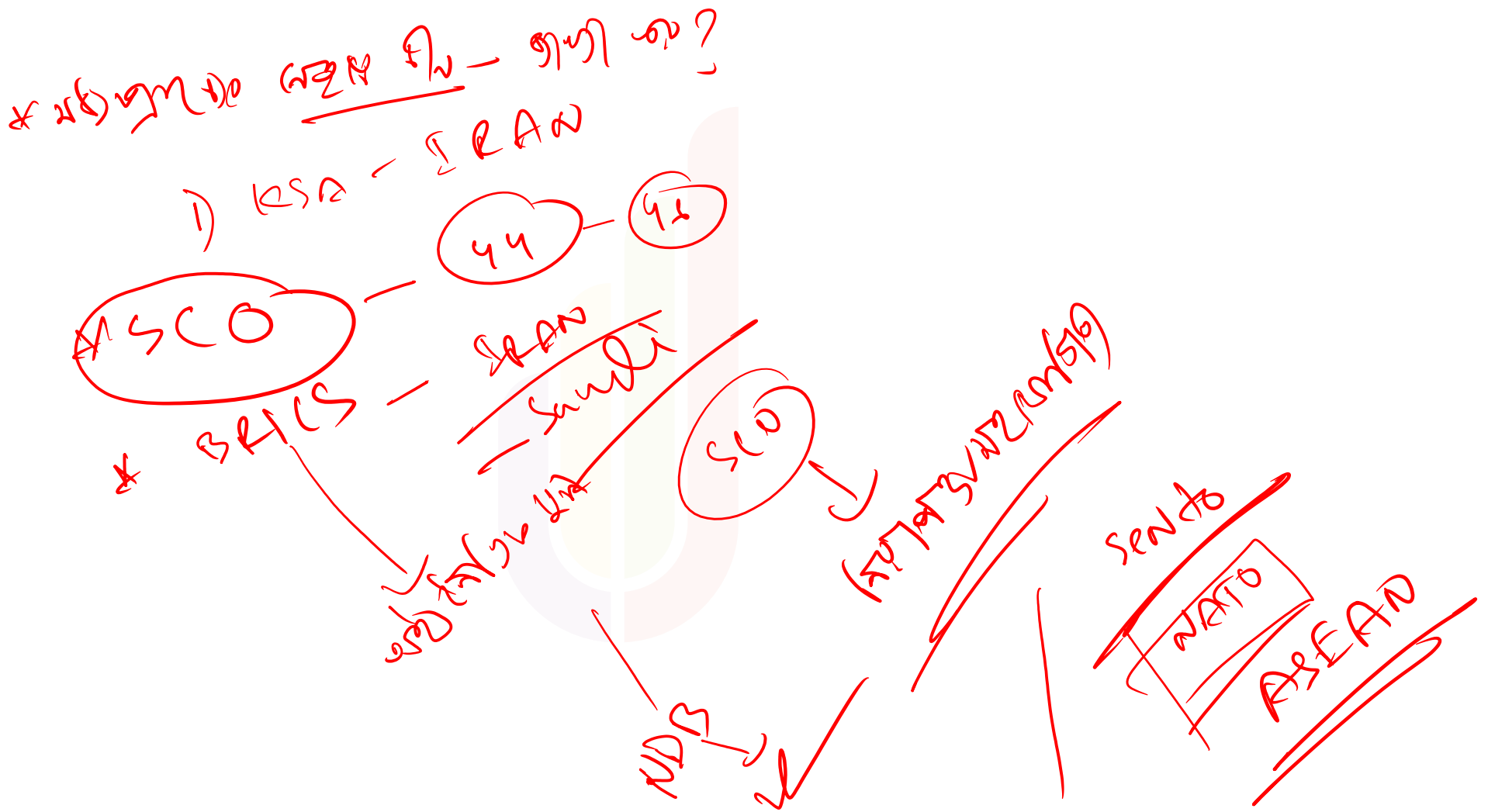

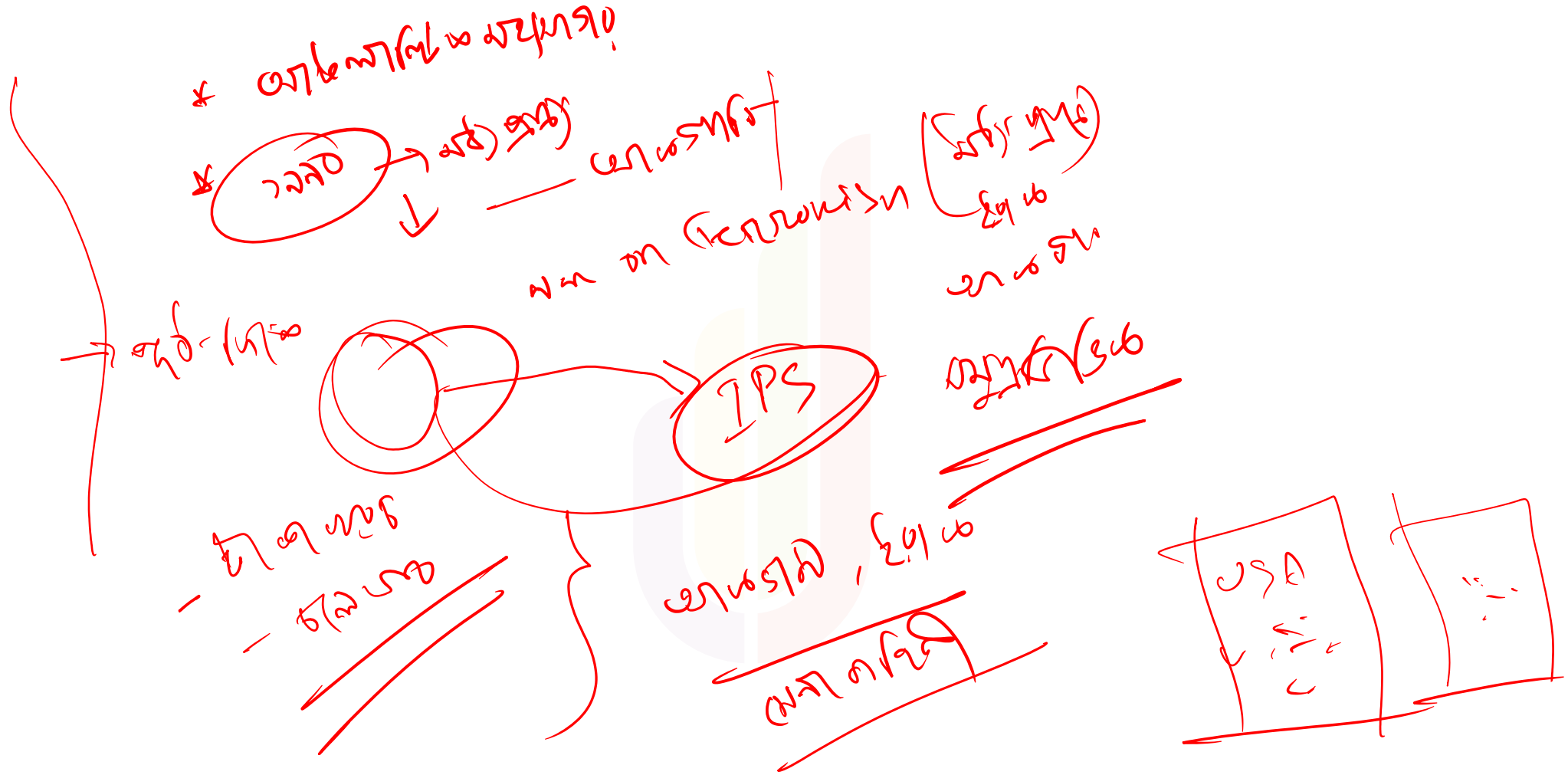
IPS

# ইরান সংকট

## ❑ ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি

ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ঠেকাতে পশ্চিমা বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর ধরে দেশটির ওপর বাণিজ্য অবরোধ দিয়ে রেখেছিল। এতে কাজ না হওয়ায় ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। চুক্তিটির আনুষ্ঠানিক নাম Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) বা 'সম্মিলিত সর্বাঙ্গীন কর্মপরিকল্পনা', স্বাক্ষরিত হয় ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই। ইরানের সাথে চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীন। সাথে ছিল ইউরোপের আরেক শক্তিধর দেশ জার্মানিও। তাই এই চুক্তিটিকে 'ইরানের সাথে P5+1 এর পারমাণবিক চুক্তি' বলা হয়। চুক্তিটি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

# ইরান সংকট

## ❑ চুক্তির প্রেক্ষাপট

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) এর অনুসন্ধান অনুযায়ী, ইরান ২০০৩ সাল থেকে শুরু করে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। এ সময়ে তারা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়েও অনেক বেশি লক্ষ্যমাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করে এবং প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন ও ভারী পানি, ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম মজুদ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অনুযায়ী, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তারা চাইলে মাত্র দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে পারমাণবিক বোমা তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারত। সেই থেকেই ইরানের উপর নানা ধরনের অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ শুরু হয়। কট্টরপন্থি ইরানি প্রধানমন্ত্রী আহমেদিনেজাদের সময়ে ইরান পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে এগুতে থাকে। ক্ষমতার রদবদলে মধ্যমপন্থি হাসান রুহানি ক্ষমতায় আসলে ২০১৩ সালে এসে দীর্ঘ ২৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে টেলিফোন সংলাপ হয়। ফলে ইরান ও পশ্চিমের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলার এবং মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

# ইরান সংকট

## ❑ চুক্তিতে যা যা ছিল

- ✓ ইরান পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত ৩.৬৭ শতাংশের বেশি ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ করতে পারবে না ।
- ✓ ইতোমধ্যেই সমৃদ্ধকৃত ১০ হাজার কেজি ইউরেনিয়ামের মজুদের মধ্যে মাত্র ৩০০ কেজি রেখে অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম পারমাণবিক ক্ষমতাধর অন্য কোনো দেশের (রাশিয়া) কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
- ✓ পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত ইরান এই ৩০০ কেজির চেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম মজুদ রাখতে পারবে না।
- ✓ ইরানের ২০ হাজার পারমাণবিক কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার ৬০টি কেন্দ্র পরবর্তী ১০ বছর পর্যন্ত সক্রিয় রাখা যাবে।
- ✓ সীমিত পারমাণবিক চুল্লিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ভারী পানি রেখে বাকি সব ভারী পানি আন্তর্জাতিক বাজারে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে দিতে হবে এবং পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত নতুন কোনো ভারী পানি উৎপাদন করা যাবে না।
- ✓ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরানের ওপর থেকে বিভিন্ন ধরনের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ইরানকে দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।
- ✓ জ্বালানি তেলসহ ইরানের বিভিন্ন পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিনা শর্তে বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হবে।
- ✓ পরবর্তীতে উভয় পক্ষ এ চুক্তি ত্যাগ করে এবং ইরান পুনরায় তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

# সৌদি-ইরান সংঘাত

## ❑ শিয়া-সুন্নি বিরোধ

সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে সংঘাতের পিছনে আরেকটি যে ব্যাপার কাজ করে তা হলো শিয়া-সুন্নি বিরোধ। সৌদি আরব ও ইরান ইসলাম ধর্মের মূল দুটো শাখা যথাক্রমে সুন্নি ও শিয়া অনুসারী। ইরান শিয়া মুসলিম বিশ্ব এবং অন্যদিকে সৌদি আরব সুন্নি মুসলিম জগতের শীর্ষ শক্তি হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে ইরানের বাইরেও শিয়া শাসনতন্ত্রের মডেল ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে- এই কারণে সুন্নি সৌদি আরবের সাথে তাদের মতাদর্শিক বিরোধ রাষ্ট্র দু'টিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

# সৌদি-ইরান সংঘাত

## ❑ সিরিয়া, ইয়েমেন ও লেবাননে প্রক্সি যুদ্ধ

সৌদি আরব ও ইরান এখন পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লেও তারা আঞ্চলিক নানা সংঘর্ষে বিরুদ্ধ পক্ষগুলোর হয়ে পর্দার পেছন থেকে লড়াই করছে। যেমন সিরিয়াতে সেখানে প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরোধী বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপকে সমর্থন দিয়ে আসছিল সৌদি আরব, কিন্তু সিরিয়ার সরকারি বাহিনী রাশিয়া ও ইরানের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে সৌদি আরব প্রতিবেশী ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছে। লেবাননে ইরানের মিত্র শিয়া মিলিশিয়া গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, ২০১৭ সালে আঞ্চলিক সংঘাতে হিজবুল্লাহর সম্পৃক্ততার কারণেই নিজেদের সমর্থনপুষ্ট লেবানিজ প্রধানমন্ত্রী সাদ হারিরিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে সৌদি আরব।

# সৌদি-ইরান সংঘাত

## ❑ সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি-ইরান সম্পর্ক

সৌদি-ইরান সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সৌদি আরবের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রদর্শন করতেন। সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে তার ছিল অত্যন্ত গভীর সখ্যতা। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও সাংবাদিক খাশোগি হত্যায় সৌদি যুবরাজের সম্পৃক্তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও যুক্তরাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ তো নেয়ইনি উল্টো তারা সৌদি আরবের সাথে বিশাল অংকের অস্ত্র বিক্রির চুক্তি করে। আর ইরানের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ইরানের সাথে ৬ জাতির করা পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে এসে ট্রাম্প ইরানের উপর আরো অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেন। ইরানের ২য় সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি জেনারেল কাশেম সোলায়মানিকেও ড্রোন হামলার মাধ্যমে হত্যা করে ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু জো বাইডেন ক্ষমতায় এসে সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলেও ইরানের সাথেও দূরত্ব আবার কমিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন, পরমাণু চুক্তিতে ফিরে আসার কথা বলেছেন।

# সৌদি-ইরান সংঘাত

মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আরো আশার সংবাদ এই যে, ২০২১ সালের এপ্রিলে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান পূর্বের বৈরিতা ভুলে ইরানের সঙ্গে 'সুসম্পর্ক' চান বলে জানিয়েছেন। ইরানের সাথে সব সংকটের সামাধানের পথ খুঁজে বের করতে সৌদি আরব আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করছে বলেও জানান বিন সালমান।

সৌদি-ইরানের বৈরিতা দূর করে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে চীনের মধ্যস্থতায় গত ১০ মার্চ (২০২৩) তেহরান-রিয়াদের মধ্যে ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সাত বছর পর ইরান ও সৌদি আরব আবারও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে। আশা করা যায় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে এই পদক্ষেপ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

# সিরিয়া সংকট

## ❑ সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূচনা

গণতন্ত্র-মুক্তি-সমৃদ্ধির আশায় ২০১০ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে তিউনিসিয়ায় আরব বসন্তের সূচনা হয়। তারপর তা সংক্রমিত হয় লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন, সিরিয়াসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ২০১১ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে সিরিয়ায় বাশার সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ দেখা দেয়। তবে তা ছিল ছোট, বিচ্ছিন্ন। সিরিয়াজুড়ে বড় ধরনের বিক্ষোভ দেখা যায় ২০১১ সালের ১৫ মার্চ। এই দিনটিকেই সিরিয়ায় গণ-আন্দোলনের শুরুর দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে আরব বসন্ত শুরুর আগে থেকেই দেশটিতে উচ্চ বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অধিকার না থাকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে।

# সিরিয়া সংকট

## ❑ সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের কারণ

### ➢ জাতিগত দ্বন্দ্ব

গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আগেই সিরিয়াতে জাতিদ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। সিরিয়াতে মুসলিমদের মাঝে সুন্নি জনসংখ্যা হলো প্রায় ৭৪%, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিয়াপন্থি আলাওয়সি গোষ্ঠী হলো মাত্র ২৬%। কিন্তু আলাওয়সি গোষ্ঠীর ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির নেতৃবৃন্দ এককভাবে সকল ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সুন্নি জনগণ সরকারি মন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। সুন্নিরা এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারানোয় এবং আসাদের Anti-Sunni Policy এর কারণে বঞ্চনার শিকার হওয়ায় তাদেরও শিয়াদের মাঝে জাতিগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, যা গৃহযুদ্ধকে উস্কে দেয়।

# সিরিয়া সংকট

## ➢ বিদেশি শক্তিদের স্বার্থ

সিরিয়া সংকটের পেছনে বৈদেশিক স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিও কাজ করেছে। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সিরিয়ার কৌশলগত অবস্থান পৃথিবীর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোর জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকাল ধরে আসাদ সরকারের অনেকটা চীন, ইরান, রাশিয়া ঘেষা নীতি যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে ক্রমাগত দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তাছাড়া ফিলিস্তিনের হামাস ও লেবাননের হিজবুল্লাহ গ্রুপের কাছে অস্ত্র পাঠানোর জন্যে সিরিয়া ইরানের একমাত্র রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সুতরাং সিরিয়ার আসাদ সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের জন্যেও ছিল অনেকটা হুমকি স্বরূপ। তাই যুক্তরাষ্ট্র আসাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের আর্থিকভাবে এবং সামরিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। উইকিলিকস কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার আন্দোলনকারীদের মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুপ্রতিম আরব দেশগুলো সিরিয়ার সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে। যেমন সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার ইত্যাদি। বিশেষত কাতার সিরিয়ার উপর দিয়ে গ্যাস লাইন ইউরোপ পর্যন্ত নিতে চায়। তাতে রাশিয়ার স্বার্থের ক্ষতি হবে বলে আসাদ সরকার কখনই তা হতে দিবেনা। তাই কাতার বিরোধী দলের পিছনে বিপুল অর্থ ঢেলেছে বাশার সরকারের পতনের জন্য।

# সিরিয়া সংকট

## ❑ সিরিয়া সংকটের সম্ভাব্য সমাধান

সিরিয়া সংকট এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক, রাশিয়া, আমেরিকা সবারই বৃহৎ স্বার্থ জড়িত এবং কেউই তাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করতে চায় না। এমন পরিস্থিতিতে সমাধান তখনই সম্ভব যখন সব পক্ষ তাদের স্বার্থ ত্যাগ করে নিষ্পাপ নিরীহ সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করবে। এজন্য জাতিসংঘকে কাগুজে বাঘ হয়ে না থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। সিরিয়া সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

✓ জাতিসংঘের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।
✓ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে।
✓ মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মীয় মতপার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে।
✓ বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে শান্তি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
✓ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠন করে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত নেই। দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ আগেই স্পষ্ট করেছেন যে তিনি তার ক্ষমতার প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজি নন। বরং তিনি ২০১১ সালের মার্চের আগের অবস্থায় ফিরতে চান। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সিরিয়ায় শান্তি ফেরানোর ব্যাপারে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। সিরিয়ায় হত্যাযজ্ঞ-ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধে তাদের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই। উপরন্তু, জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন একটি আলোচনা ২০২১ সালের জানুয়ারিতে জেনেভায় ভেস্তে যায়। সিরিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধ-অচলাবস্থার ব্যাপারে পশ্চিমা নির্ধারক শক্তিগুলো আগ্রহ হারিয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশ্লেষক সাইমন টিসডিল। এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখে একে একটি 'সীমাহীন যুদ্ধ' (endless war) বলে অভিহিত করেছেন 'Win Without War' সংগঠনের অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর স্টিফেন মাইলস।

# ইয়েমেন সংকট

## ❑ ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধের কারণ

➢ **শিয়া-সুন্নি বিরোধ :** ইয়েমেনের জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই মুসলিম এবং এদের ৬৫ ভাগ সুন্নি যারা দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে ও বাকি ৩৫ ভাগ শিয়া যারা বাস করে উত্তরাঞ্চলে। ১৯৯০ সালে দুই ইয়েমেন একীভূত হলেও কার্যত উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মাঝে প্রবল বিভাজন উপস্থিত ছিল। সুন্নিপন্থি একনায়ক আব্দুল্লাহ সালেহ ক্ষমতায় দীর্ঘকাল আসীন থাকায় তার বিরুদ্ধে শিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অনেক আগে থেকেই বিদ্রোহ করে আসছিল। ২০১১ সালের পর থেকে তা প্রকট হয়ে ওঠে। এই সুন্নি-শিয়া বিরোধ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্যই অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে উঠেছে। সরকারি বাহিনীর পক্ষে সুন্নি সৌদি ও হুতি বিদ্রোহীদের পক্ষে শিয়া ইরান অবস্থান নিয়ে ইয়েমেনের মাটিতে মূলত একটি Proxy War বা ছায়াযুদ্ধই সংঘটিত হচ্ছে সৌদি ও ইরানের মাঝে।

# ইয়েমেন সংকট

## ➢ পশ্চিমা দেশগুলোর তেলস্বার্থ

দরিদ্র দেশ ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর আকৃষ্ট হওয়ার মূল কারণ এডেন উপসাগর। লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মাঝখানে ইয়েমেনের অবস্থান। এই নৌপথ দিয়েই বিশ্বের অধিকাংশ তেলবাহী জাহাজ চলাচল করে। ইয়েমেন যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তার পক্ষে তেল সম্পদের ওপর খবরদারি করাও সহজ হবে। আর এই অংশটি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়লে তেল পরিবহনও হুমকির মুখে পড়বে। তাই ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা যাতে ইয়েমেনের ক্ষমতায় না যেতে পারে তাই সৌদি সামরিক জোটকে পশ্চিমা বিশ্ব অর্থ, অস্ত্র ও অন্যান্য সহায়তা দান করছে। ফলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

# কুর্দিস্তান সংকট

## ❑ স্বাধীন কুর্দিস্তান আন্দোলন

ওসমানীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৮০ সালে শেখ ওবায়দুল্লাহ নামক এক প্রভাবশালী কুর্দি নেতা প্রথম স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার দাবী তোলেন যেখানে কুর্দিস্তানের উপর ইরান বা তুরস্কের কোন প্রভাব থাকবে না। কিন্তু সেই বিদ্রোহ দমন করে ওবায়দুল্লাহকে ইস্তানবুল নির্বাসনে পাঠানো হয়। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ১৯১৯-২০ সালে প্যারিসে স্বাক্ষরিত 'সেভার্স চুক্তি'তে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তানের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে স্বাক্ষরিত 'লুজান চুক্তি' নামক নতুন একটি চুক্তিতে কুর্দিস্তানের কথা উল্লেখ ছিল না। বরং কুর্দিস্তান তখন ইরান, তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়।

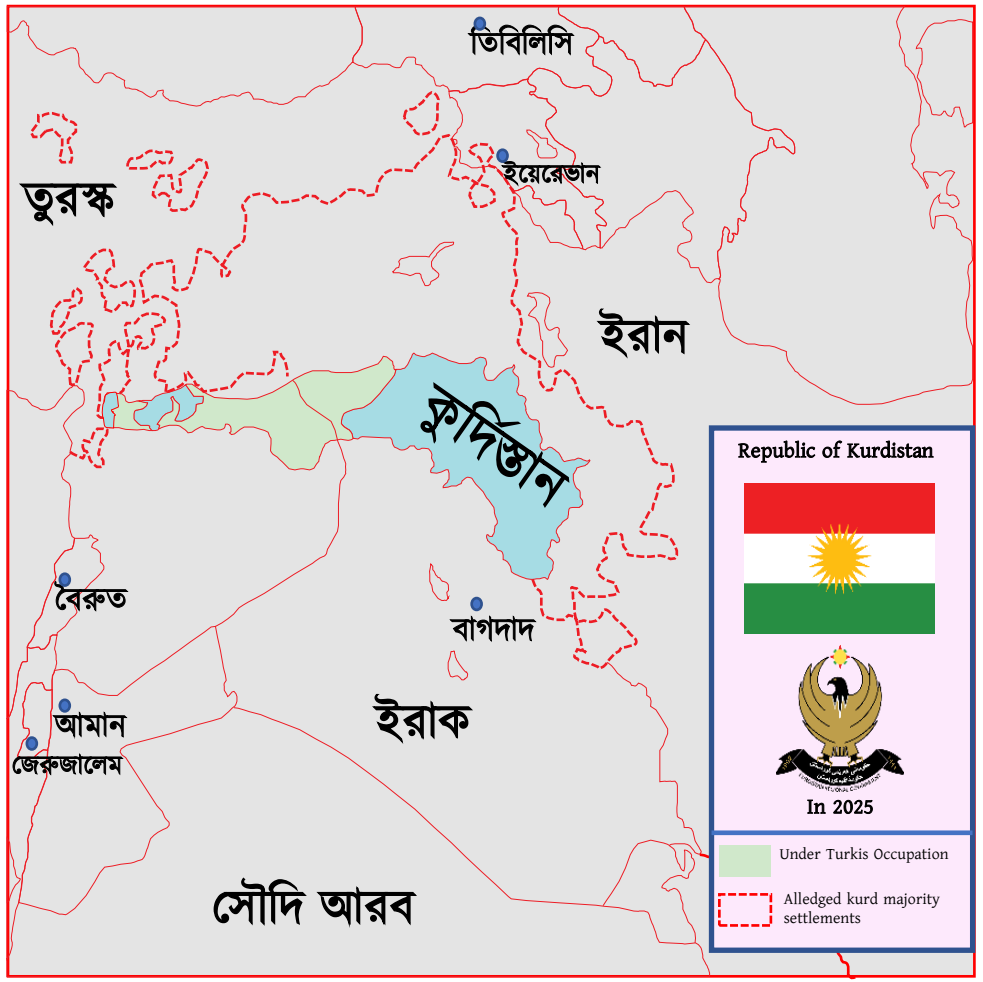

# কুর্দিস্তান সংকট

## ❑ কুর্দিদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

কুর্দিদের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী এই দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত। Kurdistan Democratic Party (KDP) এবং Patriotic Union of Kurdistan (PUK) হলো কুর্দিদের জাতীয়তাবাদী ঘরনার রাজনৈতিক দল। অপরদিকে তুরস্কে রয়েছে Kurdistan Workers Party (PKK) যারা মূলত মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক মুল্যবোধ নিয়ে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৯ সাল থেকে KDP এর নেতা ইরাকি কুর্দিস্তানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ বারজানি। তিনি তার বাবা মুস্তফা বারজানি থেকে KDP এর নেতৃত্ব পেয়েছেন। অপরদিকে PUK এর প্রধানের নাম জালাল তালেবানি। '৯০ দশকে মাসউদ বারজানি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সহায়তায় ইরানি সহায়তাপুষ্ট PUK কে পরাজিত করে ইরাকি কুর্দিস্তান থেকে বের করে দেন। ১৯৯৮ সালের গৃহযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র কুর্দি এলাকাকে বিভক্ত করে উত্তরে মাসউদ বারজানিকে ও উত্তর পশ্চিমে জালাল তালেবানিকে কর্তৃত্ব দেয়।

# মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

## ❑ মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর অতিরিক্ত প্রভাব থাকার কারণ

- মিয়ানমারে সেনা শাসন অনেক পুরানো এবং দীর্ঘস্থায়ী। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো এটিও ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে বার্মায় শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল। দেশটির সেনাবাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। বার্মার স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেন জেনারেল অং সান এবং তাকে দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বার্মার জনগণ সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো এবং ভাবতো তারাই দেশের রক্ষাকারী।
- স্বাধীনতা লাভের পর জাতিগত সংঘাত, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত হয়ে পড়ে দেশটি। এ সুযোগে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে। সেনাবাহিনী সবসময় ভাবতো যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়ে নিজ দেশের সমস্যার সমাধান করা যাবে। ফলে আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি নিয়ে সামরিক জান্তারা খুব একটা মাথা ঘামায়নি।
- স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ভিতরে জাতিগত সংঘাত মোকাবিলার জন্য বার্মার সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়ানো হয়। ফলে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করতে শুরু করে ।
- ২০১৫ সালে পাঁচ বছরের জন্য অং সান সুচির 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি' একটি বেসামরিক সরকার গঠন করলেও সেনাবাহিনীর প্রভাব থেকে বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একটি দেশে বেসামরিক সরকার যখন কার্যকরভাবে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়, তখন সেখানে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটে। মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে।

# মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- আন্তর্জাতিক সমর্থন সেনাবাহিনীর টিকে থাকার অন্যতম কারণ। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ২০০১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বার্মার সঙ্গে জাপান ও ভারতের সম্পর্ক বরাবরই ভালো ছিল। আর চীন ১৯৮৮ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশটির অর্থনৈতিক খাতেও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাছাড়া মিয়ানমারের আসিয়ান জোটে যোগদানের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মিয়ানমারে সামরিক শাসন নিয়ে এসব দেশ কখনোই তেমন উচ্চবাচ্য করেনি।
- ২০০৮ সালে মিয়ানমারের সংবিধানে দেশটির সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারের সংসদে এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়। তবে শুধু আসন সংরক্ষিত রাখাই নয়, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সেনাবাহিনীর হাতে রয়েছে। এ তিনটি বিষয় হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়। তাছাড়া ভাইস প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনী দ্বারা মনোনীত হবেন। বর্তমানে মিয়ানমারে যে সংবিধান রয়েছে, তাতে বেসামরিক সরকারের উপর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়েছে। তাই যেকোনো পরিবর্তনের জন্য সামরিক আইন প্রণেতার সমর্থন প্রয়োজন। মিয়ানমারের সংবিধান অনুযায়ী যদি ইউনিয়নের বিভেদ ঘটে, জাতীয় সংহতির বিভেদ ঘটে ও সার্বভৌম ক্ষমতা কমে আসে, এমন পরিস্থিতিতে দেশটির সেনাপ্রধান ক্ষমতা নিতে পারবেন। তবে শুধুমাত্র জরুরি অবস্থা চলাকালীন তিনি ক্ষমতা নিতে পারবেন এবং সেই জরুরি অবস্থা শুধুমাত্র বেসামরিক প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করতে পারবেন।

# ২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

## ❑ মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান কারণ

➢ সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের চাকরির মেয়াদ ছিল ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত। তার পরিকল্পনা ছিল, সেনাবাহিনী থেকে অবসরে গিয়ে সে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সমর্থিত রাজনৈতিক দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিতে (ইউএসডিপি) যোগ দেবে এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোনও একসময় ক্ষমতায় আসীন হবে। কিন্তু ইউএসডিপি নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং নিজের কোনও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ না দেখে তাকে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট করার জন্য সুচি-কে একটি প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সুচি এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। ফলে, নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিশ্চিত করার জন্য তার পক্ষে সামরিক অভ্যুত্থান ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। কারণ, ২০২১ সালের জুনের পরে মিন অং হ্লাইং একজন সাধারণ নাগরিকে পরিণত হতেন।

# ২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে রোহিঙ্গাদের ওপর জেনোসাইড সংঘটনের যে বিচার হচ্ছে, সেখানে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জেনোসাইডের যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে এই জেনোসাইডের মূল কমান্ডিং রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে বর্তমান জেনারেল মিন অং হ্লাইংকে। এছাড়াও বাইডেন প্রশাসনও মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যে জেনোসাইডের অভিযোগ এনেছে সেটা যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি রিভিউ কমিশন করা হয়েছে, সেখানেও যদি কোনও ধরনের জেনোসাইডের প্রমাণ পাওয়া যায় তার জন্যও প্রধানত দায়ী হবে জেনারেল মিন অং হ্লাইং।

  এছাড়া আর্জেন্টিনার আদালতে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতেও জেনোসাইডের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং ২০১৭ সালে রাখাইনে যে জেনোসাইড হয়েছে তার সব দায়দায়িত্ব সুচির সরকারের ঘাড়ে না গিয়ে সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে মিন অং হ্লাইং-এর ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। বাকি জীবন তাকে একটা জেনোসাইড সংঘটনকারী জেনারেলের কলঙ্ক নিয়ে কাটাতে হবে। তাই, সামরিক অভ্যুত্থান করে নিজেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে এসবের মোকাবিলা করা ছাড়া তার অন্য কোনও উপায় ছিল না।

# ২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- ২০০৮ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষমতা কাঠামো এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অবস্থানকে একটা শক্ত ভিত্তি দেওয়া হয়। যেমন: সংসদের ২৫ শতাংশ আসন সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ থাকবে; স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং সীমান্ত মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ থাকবে; রাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে সেনাবাহিনী থেকে এবং দেশের কামান্ডার-ইন-চিফ থাকবে পদাধিকার বলে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান প্রভৃতি। এরকম একটি শক্ত ভিত্তির ওপর সেনাবাহিনীকে দাঁড় করানোর পরও ক্রমান্বয়ে দেশের কাছে, দেশের মানুষের কাছে এবং বিদেশের কাছে সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তা, প্রভাব বলয় এবং ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে খর্ব হতে শুরু করে, ফলে সুচি'র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং আধিপত্যও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফলও সেনাবাহিনীকে মিয়ানমারের জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের এক ধরনের ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, গৌরব এবং আধিপত্য পুনরুদ্ধারের জন্য সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা ছাড়া সেনাবাহিনীর অন্য কোনও উপায় ছিল না।

# ২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- ২০১৫ সালে গণতন্ত্রের পথে প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন হলে মিয়ানমার গণতন্ত্রায়নের দিকে যাত্রা শুরু করার মর্মে এক ধরনের উপস্থাপনা বিশ্বমিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়। ২০২০ সালের নির্বাচনে সুচির দল মেজরিটি পেলে মিয়ানমার সত্যিকার গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে পারে, এরকম একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর মিয়ানমারে যদি সত্যিকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়, তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার বৃদ্ধি ঘটবে। পাশাপাশি লিবারেল ডেমোক্র্যাসির সুযোগ নিয়ে ইউরোপ আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমারের বিভিন্ন ধরনের ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউশনকে প্রমোট করবে, যা সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং আধিপত্যকে ক্রমান্বয়ে খাটো করে দেবে। তাছাড়া, ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউশনগুলো যদি যথাযথভাবে কাজ করতে শুরু করে তাহলে সেনাবাহিনীর যে বহুবিধ বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং লাভজনক প্রকল্প রয়েছে, সেসব ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল থেকে ‘পর্দার আড়ালে বসে দেশের গুটি চালানোর চেয়ে পর্দার সামনে এসে গুটি চালানো উত্তম’ এরকম একটা দর্শন সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করতে শুরু করে। ফলে, সামরিক অভ্যুত্থান অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

# আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী আজারবাইজান,আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া অধ্যুষিত এই ককেশাস অঞ্চল। আধুনিক যুগের শুরুতে রুশ সাম্রাজ্য এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধের কারণ হয়েছে এই অঞ্চল। সর্বশেষ ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সেখানে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধ শুরু হয়। সমাপ্তি ঘটে ১০ নভেম্বর একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। এ অঞ্চলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি- রাশিয়া ও তুরস্কের হস্তক্ষেপে স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি। বিরোধীয় অঞ্চল নাগার্নো-কারাবাখ তথা আর্মেনিয়া-আজারবাইজানের যুদ্ধটি সাম্প্রতিক কালের হলেও বিরোধের উৎস অতীতেই নিহিত রয়েছে।

## ❑ দ্বন্দ্বের ইতিহাস

নাগার্নো-কারাবাখ হচ্ছে দক্ষিণ ককেশাসের একটি স্থলবেষ্টিত ভূ-ভাগ। এটি আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মূল বিরোধপূর্ণ ভূ-খন্ড। ইতিহাস পরম্পরার অনেক পঙ্কিল পথ অতিক্রম করে এটি আজারবাইজানের অংশ হিসেবে বিশ্বসমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ২০০৮ সালের একটি প্রস্তাবে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ঐ প্রস্তাবে নাগার্নো-কারাবাখ থেকে আর্মেনীয় সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, এটি রাজনৈতিকভাবে আজারবাইজানের স্বীকৃত অংশ হলেও এখানের অধিকাংশ জনগণ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। এখানের প্রায় ১৫ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা। খ্রিষ্টধর্মীয়রা আনুগত্য পোষণ করে আর্মেনিয়ার প্রতি। অপরদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মমত্ব আজারবাইজানের প্রতি।

# আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

- ১৯৯১ সালে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান উভয় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর নাগার্নো-কারাবাখের কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই-যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া দৃশ্যত ঐ অঞ্চলকে স্বাধীনতা দিলেও মূল নিয়ন্ত্রণ প্রকারান্তরে তাদের হাতে রাখে। বিস্ময়ের ব্যাপার রাশিয়া আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান উভয় দেশকে সামরিক সহায়তা দেয়।
- ১৯৯৪ সালের মে মাসে আজারবাইজান কার্যত আর্মেনিয়ার কাছে পরাজিত হয়। এ সময়ে নাগার্নো-কারাবাখের ১৪ শতাংশ অঞ্চল আর্মেনিয়রা দখল করে নেয়। রাশিয়ার মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের ১২ মে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানীয় সেনাদের মধ্যে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে।
- ২০০৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট আজারবাইজানীদের বিরুদ্ধে কথিত জাতিগত নির্মূলের নিন্দা করে।
- অন্যদিকে ২০০৭ সালের মে মাসের মধ্যভাগে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আজারবাইজানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা আর্মেনিয়ার আগ্রাসনেরও নিন্দা করে। একই বছরের ১৪ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে নাগার্নো-কারাবাখের ওপর আজারবাইজানের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে ২০১৬ সালে ২ এপ্রিল উভয় দেশের সেনাবাহিনী আবারও যুদ্ধে লিপ্ত হয়।
- **সম্প্রতি ২০২০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।**

# আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

➢ প্রায় দেড় মাসের যুদ্ধাবশেষে ২০২০ সালের ১০ নভেম্বর একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই চুক্তিতে সই করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ও আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান। সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ আরব'র এক প্রতিবেদেন নাগার্নো-কারাবাখ শান্তিচুক্তির মূলশর্তগুলো তুলে ধরা হয়েছে। **শর্তগুলো নিম্নরূপ:**

✓ **যুদ্ধবিরতি:** চুক্তির মূল শর্তগুলোর প্রথমেই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি। বর্তমানে দুই দেশের সেনারা যে ভূমিতে অবস্থান করছেন তারা সেখানেই থাকবেন। এর ফলে, সাম্প্রতিক যুদ্ধে আর্মেনিয়ার কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া শুশা শহরসহ অন্যান্য এলাকায় আজারবাইজান অবস্থান করবে।

✓ **শান্তিরক্ষী বাহিনী:** বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে রাশিয়ার ১ হাজার ৯৬০ জন সেনা মোতায়েন করা হবে। তাদের সঙ্গে থাকবে ছোট অস্ত্র, ৯০টি আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার, ৩৮০ ইউনিট অটোমোবাইল ও বিশেষ যন্ত্র। শান্তিরক্ষীরা দুই দেশের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থান করবেন।

✓ **ভূমি ফেরত:** আর্মেনিয়া আঘদাম জেলা আজারবাইজানের কাছে ফেরত দেবে। এছাড়াও, আর্মেনিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা কালবাজার জেলা ও লাচিন জেলা আজারবাইজানের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আগে শুশার মধ্য দিয়ে নাগার্নো-কারাবাখের সঙ্গে যোগাযোগ করতো আর্মেনিয়া। এখন তারা পাঁচ কিলোমিটার প্রশস্ত লাচিন করিডোর দিয়ে সেই যোগাযোগ রক্ষা করবে।

✓ **বন্দিবিনিময় ও শরণার্থী প্রত্যাবাসন:** যেসব অঞ্চল আর্মেনিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল সেখানে ও এর আশেপাশের জেলাগুলোতে শরণার্থীরা ফিরে আসতে পারবেন। বিবাদমান দুই পক্ষই একে অপরের হাতে থাকা যুদ্ধবন্দি, আটক ব্যক্তি ও মরদেহ বিনিময় করবে।

✓ **করিডোর:** মূল ভূমি থেকে দূরে আজারবাইজানের নাখচিভান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে যাতায়াত করতে নিজেদের ভূমি ব্যবহার করার অনুমতি দিবে আর্মেনিয়া। যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরির ব্যবস্থা নিতেও কাজ করবে দেশটি।

# আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

## ❖ আজারবাইজান-আর্মেনিয়া দ্বন্দ্বে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা

➢ **তুরস্ক:** এ যুদ্ধে তুরস্ক আজারবাইজানকে সরাসরি সর্বাত্মক সমর্থন দেয়। তুরস্কের বক্তব্য হচ্ছে, এত বছরের কূটনৈতিক চেষ্টা ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার পরেও এই সংকটের কোনো সমাধান হয়নি। তাই তারা মনে করে নাগার্নো-কারাবাখের ওপর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত আজারবাইজানীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ২০১০ সালে তুরস্ক ও আজারবাইজান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে আর্মেনিয়া-আজারবাইজানের মধ্যে ছোটখাটো যুদ্ধ ঘটে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তুরস্কের পক্ষ থেকে আজারবাইজানকে বিভিন্ন রকমের সামরিক সহযোগিতাও দেওয়া হচ্ছে। তবে এই যুদ্ধে তুরস্ক কতোটা অগ্রসর হবে সেটা নির্ভর করে রাশিয়ার অবস্থানের উপরে। কারণ দক্ষিণ ককেশাসে আধিপত্য বিস্তার করে রাশিয়া। সেকারণে আঙ্কারা চাইবে না মস্কোর সঙ্গে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়াতে। **তুরস্ক যেসব কারণে আজারবাইজানের পক্ষ নিচ্ছে, সেগুলো নিম্নরূপ:**

✓ **জ্বালানি স্বার্থ:** ককেশাসের কিছু অঞ্চল জ্বালানির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জ্বালানির উৎস এবং সরবরাহ ব্যবস্থা- এই দুই কারণেই। তুরস্ক তার এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস আমদানি করে আজারবাইজানের কাছ থেকে। কাস্পিয়ান সাগরে পাওয়া তেলও আজারবাইজান তুরস্কের কাছে বিক্রি করে থাকে। আজারবাইজানের কারণে গ্যাসের জন্য রাশিয়ার ওপর তুরস্কের নির্ভরশীলতাও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হ্রাস পেয়েছে। রাশিয়ার সাথে তুরস্কের জ্বালানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২১ সালে। আঙ্কারার পরিকল্পনা হচ্ছে এর পর তারা ট্রান্স আনাতোলিয়ান গ্যাস পাইপলাইন দিয়ে আজারবাইজান থেকে গ্যাস এনে তাদের চাহিদা পূরণ করবে। তুরস্কের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এটি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজারবাইজান থেকে জ্বালানির সরবরাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য তুরস্ক যেকোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।

✓ **ঐতিহাসিক কারণ:** আজারবাইজানের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। দুটো দেশ নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে "এক জাতি, দুই দেশ" এই নীতিতে বিশ্বাসী। শুধু রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পর্যায়ে নয়, তুরস্ক ও আজারবাইজানের সাধারণ জনগণও তাদেরকে একই জাতি বলে মনে করে।

# আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

❖ **ইরান:** শিয়ারাষ্ট্র ইরান আজারবাইজান-আর্মেনিয়া যুদ্ধে আর্মেনিয়ার পক্ষাবলম্বন করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকরা ইরানের অবস্থানের কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন:

➢ **আজারি জাতীয়তাবাদের উত্থান:** আজারিরা মূলত তুর্কি বংশ। এদের পূর্বপুরুষ কয়েক শতাব্দী ধরে আজারবাইজান ও ইরান শাসন করেছিল। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া আজারবাইজান দখল করে নেয়। কাজার রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ দখলে নেন পাহলভিরা। ফলে এই অঞ্চলের তুর্কমেনরা রাজ্যহারা হন। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মতো আজারবাইজানও স্বাধীনতা লাভ করে। অবশিষ্ট আজারিদের অবস্থান ইরানে। উত্তর ইরানে আজারবাইজান নামে দুটি প্রদেশ আছে পূর্ব আজারবাইজান, রাজধানী তাবরিয, পশ্চিম আজারবাইজান, যার রাজধানী উর্মিয়া। এ দুই প্রদেশে প্রায় দুই কোটি আজারি-তুর্কি জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে বলে বিভিন্ন হিসাবে পাওয়া যায়। বহু আজারি তাদের ভূখণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত বলে মনে করেন।

➢ **আদর্শিক কারণ:** ইরান ধর্মতাত্ত্বিক শিয়ারাষ্ট্র। অন্যদিকে আজারবাইজান শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কট্টর সেকুলার রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের কারণে ইরানে অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। জনগণের মাঝে অসন্তোষও আছে। এমতাবস্থায় নিজ দেশে সেকুলারিজমের প্রভাব রোধে ধর্মনিরপেক্ষ আজারবাইজানকে শক্তিশালী অবস্থায় দেখতে চায় না ইরান।

➢ **তুরস্কের প্রভাব রোধ করা:** তুরস্ক জোরালোভাবে আজারবাইজানকে সমর্থন করে। এটি তাদের একটি স্থায়ী নীতি। তুর্কিরা মনে করেন, আজারিরা তুর্কি বংশ, যদিও তারা ভিন্ন দেশে বসবাস করে। তুরস্ক তো প্রকাশ্য বলে আজারবাইজান ও তুরস্ক এক জাতি; দুই দেশ। এমতাবস্থায় আজারবাইজানের অবস্থান দৃঢ় হওয়ার মানেই হলো ওই অঞ্চলে তুরস্কের প্রভাব বৃদ্ধি, যা কোনোভাবেই মানতে চায় না ইরান। তার মানে ককেশাস অঞ্চলে রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ধর্মের চেয়ে জাতীয়তাবোধের প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। এখানেই পালটে গেছে সম্পর্কের সমীকরণ

# আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

## ❖ রাশিয়া

পরাশক্তি রাশিয়া ১৯২০ সালের দিকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সময় মধ্য এশিয়ার সব দেশ সামরিক ও জনশক্তির জোরে দখল করে নেয়। ওই সময়ই ককেশাসের আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াও দখল করে নিজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করে নিয়েছিল। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সোভিয়েতের পতনের পরও এ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। এই অঞ্চল বলতে গেলে এখন তাদের একচ্ছত্র অস্ত্রের বাজার। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছে রাশিয়া। এই অঞ্চলে কিছু হলে তারাই নিজের প্রভাব খাটিয়ে মীমাংসা করে। তবে এই প্রভাব এখন ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধেও তা দেখা গেছে।

## ❖ পাকিস্তান

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ৩০ বছরের আগেও যুদ্ধে আজারবাইজানকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে পাকিস্তান। ওই সময় পাকিস্তান নিজে বর্তমানের মতো শক্তিশালী ছিল না। পাকিস্তান বর্তমানে একমাত্র মুসলিম দেশ পরমাণু বোমার অধিকারী। তবে তারা চীনের সহায়তায় আরো অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্রের অধিকারী। জেএফ-১৭ জঙ্গিবিমান, ট্যাঙ্ক, মিসাইলসহ অন্যান্য অস্ত্র তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। এবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তুরস্কের পরেই পাকিস্তান আজারবাইজানকে পূর্বের মতই মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ হিসাবে পূর্ণ সমর্থন জানায়। বিভিন্ন পত্রিকায় খবর এসেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা আজারি সৈন্যদের সাথে আর্মেনিয়ার সাথে যুদ্ধ করছে। এমনকি আর্মেনিয়াও এ নিয়ে অভিযোগ করেছে। এ কারণে আজারবাইজানিরা যুদ্ধ চলা অবস্থায় অনেক বাসাবাড়িতে তুরস্কের পতাকার সাথে পাকিস্তানি পতাকাও উড়িয়েছে।

# ভূমধ্যসাগর সংকট

চিত্র: ভূমধ্যসাগরের অবস্থান

# ভূমধ্যসাগর সংকট

## ❖ তুরস্ক বনাম গ্রিস ও সাইপ্রাস শত্রুতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেকাল-একাল

১৪৫৩ সালে অটোমানদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের মাধ্যমে গ্রিস অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮৩২ সালে Treaty of Constantinople এর মাধ্যমে গ্রিস অটোমানদের হতে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পরাজয় হলে মূলভূমি তুরস্ক ছাড়া সাম্রাজ্যের বাকি অংশ ব্রিটিশ আর ফ্রেঞ্চদের নিকট হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনকি ব্রিটিশরা অটোমানদের রাজধানী ইস্তাম্বুল এবং বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালিরও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আর তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স ও আর্মেনিয়া তুরস্কের চতুর্মুখী দখল নেয়। অতঃপর, তুর্কিরা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে গ্রিক, আর্মেনিয়ান আর ব্রিটিশদের হটিয়ে ১৯২৩ সালে স্বাধীনতা লাভ করে Treaty of Lausanne এর মাধ্যমে। এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই গ্রিক-তুরস্ক শত্রুতার সৃষ্টি। এখনও সমুদ্র-সীমা, সাইপ্রাস প্রভৃতি নিয়ে তুরস্ক-গ্রিস দ্বন্দ্ব চলমান। এমনকি আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যকার সমুদ্র-সীমাও নির্ধারিত হয়নি।

গ্রিস আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সীমা আইন-১৯৮২ এর স্বাক্ষরকারী দেশ হলেও তুরস্ক এটিতে স্বাক্ষর করেনি। কারণ, তুরস্কের পশ্চিমের জলসীমায় পূর্ব ইজিয়ান সাগরে অনেকগুলো গ্রিক দ্বীপ রয়েছে যাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমুদ্র-সীমা যথাক্রমে ১২ ও ২০০ নটিক্যাল মাইল ধরা হলে তুরস্কের জলসীমার নিয়ন্ত্রণ মারাত্মক ভাবে ক্ষুণ্ন হয়। তাই তুরস্ক এই রাজনৈতিক সীমা ৬ নটিক্যাল মাইল বজায় রাখতে চাপ অব্যাহত রাখছে যা কয়েক দশক ধরে তুরস্ক ও গ্রিস উভয়ে মেনে আসছিল। কিন্তু গ্রিস তার সমুদ্র-সীমা এখন ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণের কথা বলছে। আবার, তুরস্ক-গ্রিস স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তিতে পূর্ব ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলোতে সামরিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও বর্তমানে গ্রিসের অব্যাহত সামরিকীকরণ দুই দেশের সম্পর্কে আরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

# ভূমধ্যসাগর সংকট

## ➢ সাইপ্রাস নিয়ে দ্বন্দ্ব

সাইপ্রাস সংখ্যাগুরু গ্রিক এবং সংখ্যালঘু তুর্কি জনগোষ্ঠীর একটি ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ। এই দ্বীপটি ১৫৭১ সালে অটোমানরা দখল করে নেয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পতন হলে দ্বীপটি সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। এরপর থেকেই শুরু হয় গ্রিক ও তুর্কি সাইপ্রিয়টদের বিভাজন। গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ 'ইনোসিস (Enosis)' নামের একটি ধারণা সাইপ্রাসে গ্রিক সাইপ্রিয়টদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাইপ্রাসকে গ্রিসের সাথে সংযুক্তিকরণ। ১৯৫০ এর দশকে সাইপ্রাস অর্থোডক্স চার্চ এবং গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টদের 'EOKA' নামক একটি চরমপন্থি সংগঠন ইনোসিস বাস্তবায়নে সহিংস কার্যক্রম শুরু করে। ফলশ্রুতিতে বহু ব্রিটিশ ও তুর্কি সাইপ্রিয়ট সহিংসতার শিকার হয়। অবশেষে, জুরিখ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬০ সালে ব্রিটিশদের থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রিপাবলিক অব সাইপ্রাস গঠিত হয়।

নব-রচিত সংবিধানে তুর্কি সাইপ্রিয়টদের অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছিল এবং গ্রিস ও তুরস্ককে এই দ্বীপের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা সংখ্যালঘু তুর্কি সাইপ্রিয়টদের হত্যা এবং বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে থাকে এবং ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত গ্রিস ২০,০০০ সেনা প্রেরণ করে। অবশেষে জাতিসংঘ ১৯৬৪ সালে শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করে যা আজ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে।

কিন্তু গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলে সাইপ্রাস গ্রিসের অধীনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে তুরস্ক সাইপ্রাসে সামরিক অভিযান চালায় এবং দ্বীপটির উত্তর অংশ দখলে নেয়। ১৯৮৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উত্তর অংশটি 'Turkish Republic of Northern Cyprus' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং আজ অবধি শুধুমাত্র তুরস্ক তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

# ভূমধ্যসাগর সংকট

অন্যদিকে গ্রিক অধ্যুষিত রিপাবলিক অব সাইপ্রাস নামে পরিচিত দ্বীপের দক্ষিণ অংশ জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত রাষ্ট্র। ২০০৪ সালে দুই অংশকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধীনে একটি গণভোট আয়োজিত হয়েছিল। উত্তর সাইপ্রাসের ৬৫% জনগণ 'হ্যাঁ' ভোট দিলেও দক্ষিণের ৭৬% জনগণ 'না' ভোট দেয়। ফলে একত্রীকরণ সম্ভব হয়নি। ফলে তুরস্ক এবং নর্দার্ন সাইপ্রাসের সাথে সাইপ্রাসের সমুদ্র-সীমা নিয়ে চরম বিরোধ রয়েছে।

সাইপ্রাসের সমুদ্র-সীমার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তুরস্ক ও নর্দার্ন সাইপ্রাস দাবি করে। সাইপ্রাস তার দাবীকৃত এলাকায় আমেরিকান কোম্পানি এক্সন মবিল, ফ্রেঞ্চ কোম্পানি টোটাল এবং ইতালিয়ান কোম্পানি এনিকে গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে, তুরস্ক এই বিবদমান এলাকায় নিজেদের কোম্পানিকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়েছে। এই নিয়ে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। গ্রিস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাইপ্রাসকে সমর্থন দিচ্ছে। উত্তর সাইপ্রাসে এখনও তুরস্কের ৪০,০০০ সেনা মোতায়েন রয়েছে সম্ভাব্য গ্রিক হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্য। মূলত, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তুরস্ক ও গ্রিস যথাক্রমে নর্দার্ন সাইপ্রাস ও সাইপ্রাসকে প্রক্সি হিসেবে ব্যবহার করছে।

# ভূমধ্যসাগর সংকট

## ❑ ইসরায়েল-লেবানন বৈরিতা

ইসরায়েল-লেবানন দ্বৈরথ এখন স্থলযুদ্ধ থেকে জলসীমায় এসে ঠেকেছে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত দুই দেশ বড় কোনো বিরোধে না জড়ালেও সম্পর্ক ভালো ছিল না। ১৯৮২ সালে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবানন আক্রমণ করে যার ফলশ্রুতিতে হিজবুল্লার জন্ম হয়। ২০০০ সালে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবানন ত্যাগ করে এবং জাতিসংঘ দুই দেশের মাঝে ব্লু লাইন নামক একটি সীমান্ত রেখা প্রতিষ্ঠা করে যা শান্তিরক্ষা মিশন United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে।

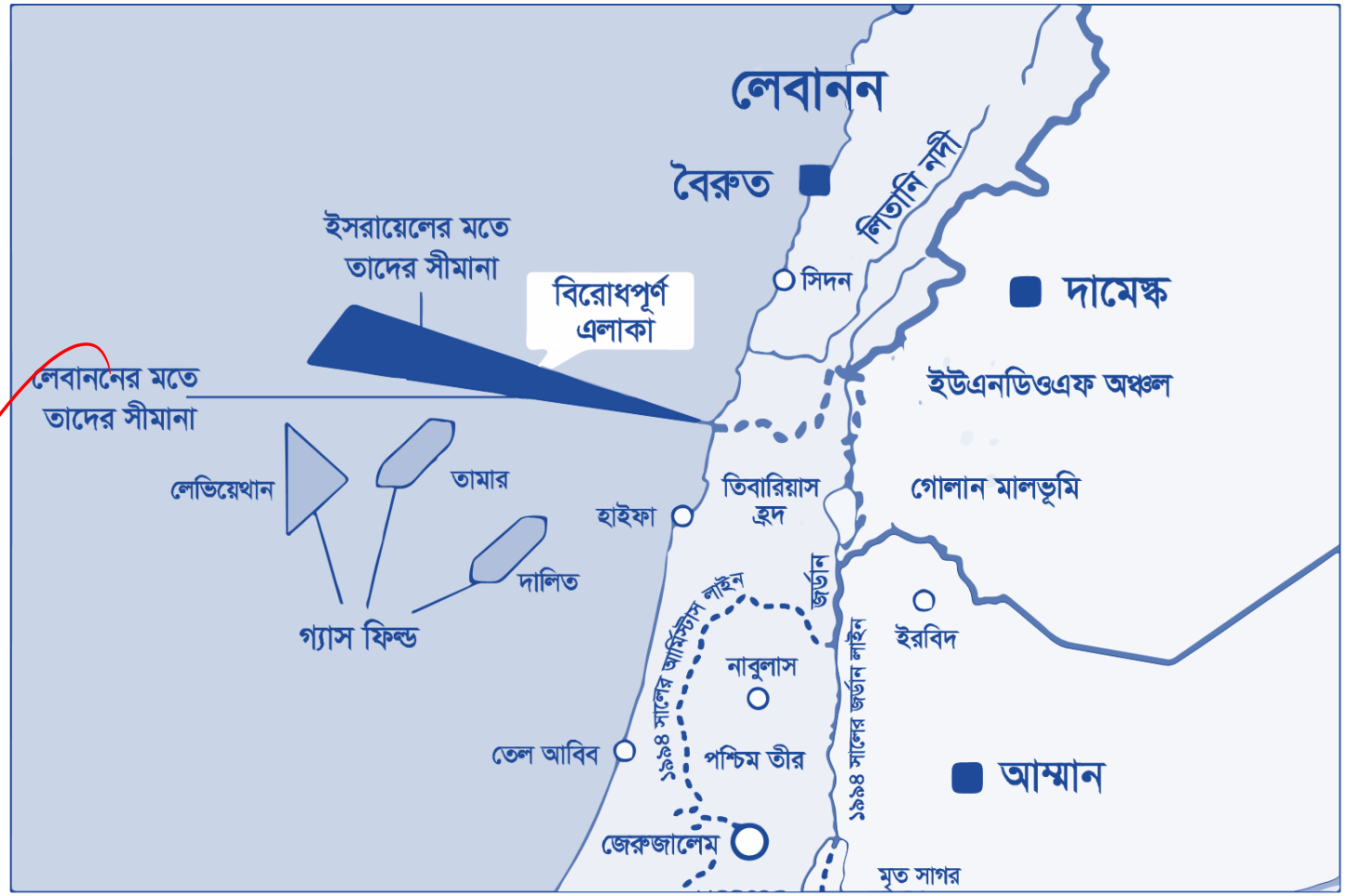


চিত্র: ইসরায়েল-লেবাননের বিরোধপূর্ণ সমুদ্র-সীমা এলাকা (কালো) চিহ্নিত)

# ভূমধ্যসাগর সংকট

কিন্তু ২০০৬ সালে ইসরায়েল ও হিজবুল্লার মধ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তারপর থেকেই সীমান্তে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ বিদ্যমান রয়েছে।

এখন নতুন করে যুক্ত হয়েছে সমুদ্র-সীমা বিরোধ। ২০০৮ সালে লেবানন সাইপ্রাসের সাথে তার সমুদ্র-সীমা নির্ধারণ করে। কিন্তু সমস্যা হলো, ২০০৯ সালে লেবাননের দক্ষিণের জল-সীমানার ৮৫০ বর্গকিলোমিটার বিতর্কিত এলাকা ইসরায়েল নিজের বলে দাবি করে। লেবানন বিষয়টি জাতিসংঘে নিয়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্র এতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ৮৫০ বর্গ কি.মি. এলাকাকে দুইটি অংশে ভাগ করে দেয় যার মধ্যে ৪৬৮ বর্গ কি.মি. এলাকা লেবাননকে এবং ৩৯২ বর্গ কি.মি. এলাকা ইসরায়েলকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

কিন্তু লেবানন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ তাদের মতে যেখানে ইসরায়েলের অধিকারই নেই, সেখানে অবৈধ দাবি উত্থাপন করে আমেরিকার মাধ্যমে প্রায় ৫০% সমুদ্র এলাকা ইসরায়েল নিজের করে নিচ্ছে। উল্লেখ্য, লেবানন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু, ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সীমা আইন-১৯৮২ তেও স্বাক্ষর করেনি। ২০১৩ সালের আমেরিকার এই মধ্যস্থতা ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধানের আশা কমে যায়। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের টোটাল, ইতালির এনি এবং রাশিয়ার নোভাটেক কোম্পানিকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়েছে লেবানন।

# ভূমধ্যসাগর সংকট

## ❑ ভূমধ্যসাগর জটিলতায় রাশিয়া ও আমেরিকার ভূমিকা

ভূমধ্যসাগরের এরকম এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলায় দুই বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূমিকাও রয়েছে। এখানে কে কাকে টেক্কা দেবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমেরিকা সমর্থিত ইস্টমেড গ্যাস পাইপলাইন হয়ে উঠতে পারে রাশিয়ার গলার কাঁটা। ইউরোপের জ্বালানি চাহিদার প্রায় ৭৭% ই আমদানিকৃত। আর ইউরোপে গ্যাসের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ হল রাশিয়া। ভৌগোলিক দিক থেকে কাছে হওয়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে ইউরোপের প্রায় ৪৩% গ্যাসের চাহিদা মেটায় রাশিয়া। কিন্তু এই ৪৩% গ্যাস আটলান্টিকের অপর পাড়ের দেশ আমেরিকা থেকে এলএনজি রূপে আমদানি করলে ইউরোপের ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যেত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইউরোপ রাশিয়ার গ্যাসের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে রাশিয়া তার রাজনৈতিক প্রভাব অব্যাহত রাখতে পারছে। তাই ইউরোপ বিকল্প কোনও দেশ থেকে পাইপলাইন দিয়ে গ্যাস আমদানি করার মাধ্যমে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে চাইছে। আর এ উদ্যোগকে আমেরিকা তার সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করছে।

# ভূমধ্যসাগর সংকট

২০১৪ সালে ইউক্রেন সংকটকালে আমেরিকা ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। রাশিয়া থেকে ইউক্রেন হয়ে ইউরোপে গ্যাস পাইপলাইন তখন বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে বিপাকে পড়ে রাশিয়া। কিন্তু রাশিয়া নতুন ২ টি পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে তার সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। একটি হলো তুরস্ক হয়ে ইউরোপে প্রবেশকারী ৯০০ কি.মি. দীর্ঘ টার্ক-স্ট্রিম পাইপলাইন যা কৃষ্ণ সাগরের নিচ দিয়ে গেছে। অন্যটি হলো, জার্মানি হয়ে ইউরোপে প্রবেশকারী নর্ড-স্ট্রিম পাইপলাইন যা বাল্টিক সাগরের নিচ দিয়ে গেছে। অপরদিকে সিরিয়াতে রাশিয়া, কাতার এবং ইরানকে হটিয়ে জ্বালানির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে সিরিয়ান জলসীমায় গ্যাস সম্পর্কিত বিষয়ে রাশিয়ান কোম্পানি Soyuzneftgaz ২৫ বছরের চুক্তিও করেছে। কিন্তু ইউরোপ রাশিয়ার গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমাতে বিকল্প প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে এবং অবধারিতভাবে আমেরিকারও এতে সমর্থন রয়েছে। সাউদার্ন গ্যাস করিডর নামে পরিচিত এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত হলে আজারবাইজান হতে গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছাবে। তুর্কমেনিস্তান-আজারবাইজান রুটে ট্রান্স-কাস্পিয়ান পাইপলাইন, আজারবাইজান-জর্জিয়া-তুরস্ক রুটে ট্রান্স-আনাতোলিয়ান পাইপলাইন (Trans-anatolian pipeline -TANAP) এবং তুরস্ক-গ্রিস-ইতালি রুটে 'Trans-adriatic sea pipeline' প্রতিষ্ঠা হলো এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তুরস্ক রাশিয়া সমর্থিত টার্ক-স্ট্রিম পাইপলাইন এবং আমেরিকা সমর্থিত TANAP নির্মাণের মাধ্যমে উভয় দিকেই সমতা রক্ষা করছে। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকা সমর্থিত ইস্টমেড গ্যাস পাইপলাইন এবং সাউদার্ন গ্যাস করিডর ইউরোপের জ্বালানি চাহিদা অনেকাংশে মেটাবে যা রাশিয়ার অন্যতম ভালো বিকল্প।

# বাণিজ্য যুদ্ধ

## ❖ যুক্তরাষ্ট্র - চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের ক্রমবিকাশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষণবাদী ভাবাদর্শের সমতলে চীনও নিয়ম বহির্ভূত বাণিজ্য চালানো শুরু করছে। এটিই দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধকে উসকে দিচ্ছে। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বেইজিং সফরের মাধ্যমে আমেরিকার সাথে চীনের সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়। এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উভয় দেশ কৌশলগতভাবে অনেক লাভবান হয়েছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ১৯৭২ সালে চীন জাতিসংঘের সদস্য পদসহ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়েছে এবং তাইওয়ানের উপর চীনের সার্বভৌমত্বের দাবি স্বীকৃত হয়েছে।

চীন মনে করে চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উভয় দেশের পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭ সালে সাবেক মার্কিন প্রশাসন ফার্স্ট নীতি গ্রহণ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে এমন পারস্পরিক শ্রদ্ধার মৌলিক নীতিগুলোকে বর্জন করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র একতরফা নীতি প্রচার আরম্ভ করে এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। সেইসাথে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ বিশেষ করে চীনের উপর শুল্কারোপের এবং চীনের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা শুরু করে। এ কারণে দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং মুক্ত বাণিজ্যের নীতির জন্যে হুমকির সৃষ্টি করেছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার সময় চীনের কড়া সমালোচনা করেছিলেন সাবেক ট্রাম্প প্রশাসন। চীনের উপর ট্রাম্পের এই ক্ষোভের প্রধান কারণ হলো উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়া বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চীনের উপর ভরসা করেছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু তার ভাষায় চীন ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া ট্রাম্প প্রশাসনের বিশ্বায়ন ও পরিবেশ নীতিকে সমর্থন করেনি চীন।

# বাণিজ্য যুদ্ধ

## ❖ যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধের স্বরূপ

গত ৫০০ বছরে প্রায় ১৬টি বাণিজ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যার ১২টি নিষ্পত্তি হয়েছে যুদ্ধের দ্বারা। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকাকে মহান করা অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকাকে প্রমাণ করার জন্যে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের অভিমত, আমেরিকান পণ্যের উপর বিপুল করারোপ করে আমেরিকান বাণিজ্য ঘাটতি বিপুলাংশে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে চীন দায়ী। এজন্য ২০১৮ সালের ২৩ মার্চ ট্রাম্প প্রশাসন সর্বপ্রথম লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম পণ্যের উপর যথাক্রমে ২৫% ও ৪০% শুল্কারোপ ঘোষণা করে। এটি প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার সমান আমদানিকৃত চীনা পণ্যের উপর কার্যকর হয়। এর জবাবে ২০১৮ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা ১২৮টি পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক বৃদ্ধি করে চীন। যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের উপক্রম হয়।

২০১৮ সালের মে মাসে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পর সম্ভাব্য বাণিজ্য যুদ্ধ স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৫ জুন, ২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসন ৫০০০ কোটি ডলারের চীনা পণ্যের উপর নতুন করে ২৫% আমদানি শুল্ক আরোপ করে। ৬ জুলাই, ২০১৮ বার্ষিক ৩৪০০ কোটি ডলার বাণিজ্য হয় এমন ৮১৮ চীনা পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক কার্যকর হয়। একই দিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫৪৫টি পণ্যের উপরও চীনের ২৫% শুল্ক আদায় শুরু হয়। আর এই পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য যুদ্ধ।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই অর্থনীতির পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপে বিশ্ব অর্থনীতি এখন হুমকির সম্মুখীন। গোটা বিশ্ব এই বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এরই মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে এ অশুভ বাণিজ্য যুদ্ধের বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করছে।

# বাণিজ্য যুদ্ধ

## ❖ আন্তর্জাতিক বাজার ও বিশ্ব অর্থনীতিতে বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব

- পৃথিবীর শীর্ষ দুই অর্থনীতির দেশ যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারও টালমাটাল। এই দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এশিয়া ও ইউরোপের নানা দেশের উপর। যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে ক্ষতির মুখ দেখছে নিম্ন আয়ের দেশগুলো।
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় বাজার। বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে অস্থিতিশিল আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের সঠিক দামে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে না। অনেক দেশই এ পরিস্থিতিতে ভিন্ন পথ বেছে নিচ্ছে লোকসানের সম্মুখীন হয়ে আমদানিকারক দেশগুলো এখন ইউরোপের দেশগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ছে। এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের আক্রমণাত্মক বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে জোট গঠনের জোর চেষ্টা চালাচ্ছে চীন।
- বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের আশঙ্কা বাণিজ্য যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে বড় অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি করবে। দেশে দেশে কর্মসংস্থান আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ বেড়ে গেছে। হংকং ও সিঙ্গাপুরের মতো, এশিয়ার তুলনামূলক ছোট অর্থনীতির দেশগুলো বড় ঝুঁকির মধ্যে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ বাণিজ্য যুদ্ধ অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
- অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যেরও উর্ধ্বগতি হবে। ফলে ভোক্তাদের সেই পণ্য বা সেবা অধিক দামে কিনতে বাধ্য হতে হবে।
- অর্থনীতিবিদ মরগান স্ট্যানলির মতে, চীন-যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কারোপের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে ০.৬% এবং বৈশ্বিক জিডিপিতে ০.১% প্রভাব পড়েছে। বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগকারীরা দ্বিধায় পড়বে এবং তাদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হবে। আবার অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সরে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক ঘাটতি ও বেকারত্বের সংখ্যা বাড়বে। এছাড়াও এই যুদ্ধের মূল প্রভাব পড়বে দুই দেশের শ্রমজীবীদের উপর।

# বাণিজ্য যুদ্ধ

## ❖ বাণিজ্য যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

বিশ্ব অর্থনীতির দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে প্রায় দুই বছর ধরে বাণিজ্য যুদ্ধ চলার পর ১৫ জানুয়ারি ২০২০ হোয়াইট হাউসে উভয় পক্ষের মাঝে স্বাক্ষরিত হয় প্রথম ধাপের বাণিজ্য চুক্তি। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী লিউ হের মধ্যে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক এই চুক্তি। চুক্তি অনুসারে, ২০১৭ সালের চেয়ে কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি ডলারের মার্কিন পণ্য বেশি আমদানি করবে চীন, পণ্য নকল করার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বেইজিং এবং দেশদ্বয়ের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে ২৫% শুল্ক আরোপ বহাল থাকবে। চুক্তিতে আরো শুল্ক হ্রাসের সময়সীমা, আর্থিক পরিষেবা বা হুয়াওয়ের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। চীন-মার্কিন এই বাণিজ্য চুক্তির ১ম ধাপ শেষে তাই বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে বলা যাবে না। এখনো এই বাণিজ্য যুদ্ধ স্তিমিত অবস্থায় আছে।

Phase One এই চুক্তির পরেও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কিছু নিষেধাজ্ঞা এবং শুল্কারোপ এই যুদ্ধকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। সর্বশেষ ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসে। তিনি পূর্বের শুল্কারোপ মিত্রদের সাথে আলোচনা না করে এবং পরবর্তী বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত বহাল রাখার আদেশ দেন। এ থেকে ধারণা করা যায় যে বাণিজ্য যুদ্ধের শীঘ্রই অবসান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মাঝে বাণিজ্যযুদ্ধ যেকোনো মূল্যে এড়াতে হবে। এখন পর্যন্ত যতদূর দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আলোচনার টেবিলে ফিরে আসা পর্যন্ত আরও অনেক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা ঘোষিত হতে পারে। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং কোন সুফল দৃশ্যমান হবে না।

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- "শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র, প্যালেস্টাইন এবং ইসরাইলকে বৃহত্তর বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে"- আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সংঘাতের টেকসই সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? **[৪৫তম বিসিএস লিখিত]**
- মিয়ানমারের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট কি আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। **[৪৪তম বিসিএস লিখিত]**
- মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি তেহরান ও সৌদি আরবের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। **[৪০তম বিসিএস লিখিত]**
- সিরিয়া যুদ্ধে শিয়াদের সম্পৃক্ততার ফলে যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে বলে আপনি মনে করেন? **[৩৮তম বিসিএস লিখিত]**
- সিরিয়া সংকটের ভবিষ্যৎ কী? **[৩৮তম বিসিএস লিখিত]**
- ইরানের পারমাণবিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টার প্রেক্ষিত ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা করুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অপর কয়েকটি দেশের সাথে ২০১৬ সম্পাদিত চুক্তি ইরানের পারমাণবিক পরিকল্পনার কি প্রভাব ফেলবে? **[৩৭তম বিসিএস লিখিত]**

# লেকচার-০৮

৪:৫০

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী একটি বিধ্বস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবকাঠামো বিনির্মাণ ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা এবং সরকার প্রধানদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। যদিও যে মাত্রায় উন্নয়ন কাম্য ছিল সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় উন্নয়ন অর্জিত হয়নি। তারপরও বিদেশি শাসক শ্রেণির নির্যাতন নিপীড়নে বিধ্বস্ত এ দেশ আজ যে পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটিও কম নয়। কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দেশিয় কাজেই নয়, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে এবং বিশ্বের অনেক দেশের মধ্যে লড়াই করে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের দেশের নাম বিশ্ব মানচিত্রে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল করেছে।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

## ❖ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনসমূহ

দেশিয় গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলেও নানাবিধ সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব এবং নেতৃত্বও দিচ্ছে। নিচে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো :

➢ **উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রবেশ :** জাতিসংঘ ১৯৭১ সালে এলডিসি ক্যাটাগরি চালু করে। জাতিসংঘের এলডিসি তালিকাভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের শর্ত হলো ৩টি। যথা

**ক.** মানব সম্পদ সূচক (৬৬ বা এর বেশি পয়েন্ট);

**খ.** মাথাপিছু আয় সূচক (১২৩০ মার্কিন ডলার বা এর বেশি অর্জন);

**গ.** অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা (৩২ শতাংশের নিচে থাকা)।

বাংলাদেশ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। ১ জুলাই, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত করে। ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হওয়ার জন্য জাতিসংঘের এলডিসি ক্যাটাগরির ৩টি শর্ত অর্জন করে (মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ৭২.৮ পয়েন্ট, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ২৪.৮ পয়েন্ট আর মাথাপিছু আয় সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ১২৭২ মার্কিন ডলার)।

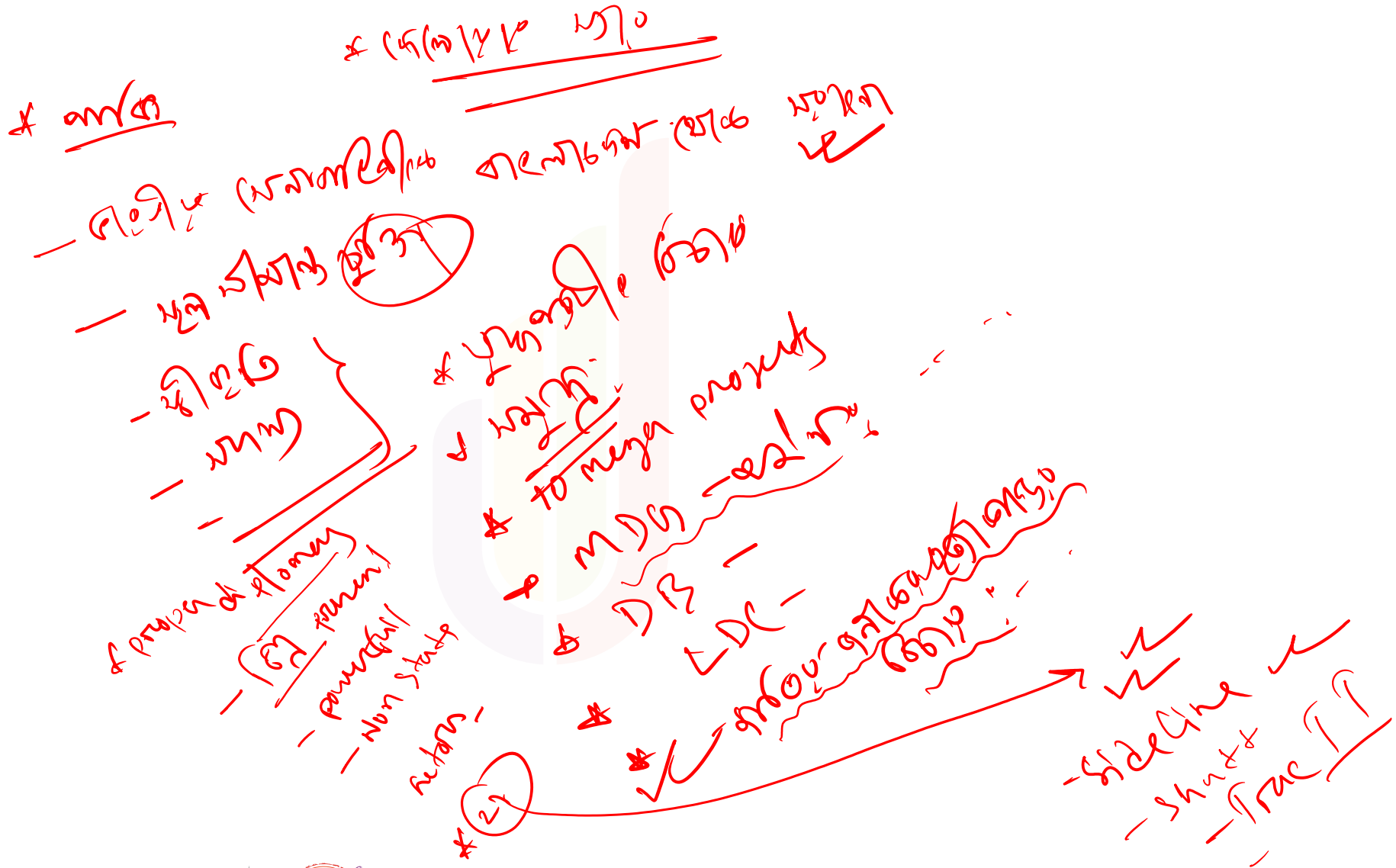

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) তার ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্য হিসেবে ঘোষণা দেয়। তবে শর্ত ছিল এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে সূচকের একই ধারা বজায় রাখতে হবে ২০২১ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশ ২০২১ সালে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে চূড়ান্ত উত্তরণের সুপারিশ দেয় সিডিপি।
- একই ধারা বজায় থাকলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার কথা। তবে করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশ বাড়তি অরও দুই বছর সময় পায়। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হবে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হলেও নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ৩ বছর পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।
- উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে জিএসপি সুবিধা পায় তা ২০২৯ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে। পরবর্তীতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে আবেদন করতে হবে।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন :** সবচেয়ে আনন্দের ও গর্বের বিষয় হচ্ছে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং সংস্থাও মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিববর্ষ পালনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বিশ্বের ১৯৩টি দেশে উদযাপিত হচ্ছে মুজিববর্ষ। তাছাড়া ইউনেস্কো মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গবেষণা, সৃজনশীলতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিকাশে তরুণদের উৎসাহিত করতে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর এ পুরস্কার প্রদান করবে সংস্থাটি। তাই জাতির জনকের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ তাঁর ইতিহাস ও গৌরব মূল্যায়নের সুযোগ লাভ করলো।

**মুজিববর্ষের সময়কাল:** ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২২।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচার :** আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায় ছিল বাঙালি জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য সম্পন্ন করতে না পারা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তা করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কলঙ্কের দাগ মোচন করতে সক্ষম হলো। জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য করতে পারা প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের কূটনৈতিক শক্তির সক্ষমতা। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার বিঘ্নিত করার জন্য অনেক আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তা সম্পন্ন করে নিজের অস্তিত্ব বিশ্ব অঙ্গনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বাকি খুনিদের ফিরিয়ে আনতেও জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
- **যুদ্ধাপরাধীদের বিচার :** বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বড় অর্জন জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু করা। ১৯৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে ১৯ নং আইন দ্বারা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) গঠন করা হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ২৫ মার্চ, ২০১০ এবং দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ২২ মার্চ, ২০১২। চূড়ান্ত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে ৬ জনের। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনাল জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট রায় প্রদান করেছে ৪১টি। যুদ্ধপরাধীদের বিচার করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ তাঁর সক্ষমতা ও আইন ব্যবস্থার উন্নয়ন তুলে ধরতে সক্ষম হলো।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **সমুদ্র বিজয় :** গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেখানেই কালের পরিক্রমায় গড়ে ওঠা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের বিরোধ ছিল দুই দেশের সঙ্গে (ভারত ও মিয়ানমার)। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্র সীমা বিরোধ মামলার রায় জয় ১৪ মার্চ, ২০১২ সালে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে রায় দেয় জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea)। এই রায়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার মধ্যে বাংলাদেশ লাভ করে ১,১১,০০০ বর্গ কি. মি.।

বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলার রায় হয় ৭ জুলাই, ২০১৪ সালে। বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি মামলার রায় দেয় নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত PCA (Permanent Court of Arbitration)। এই রায়ে বাংলাদেশ-ভারত বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ পায় ১৯,৪৬৭ বর্গ কি. মি. আর ভারত পায় ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি.। তবে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টী পায় ভারত। বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার দৈর্ঘ্য ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.।

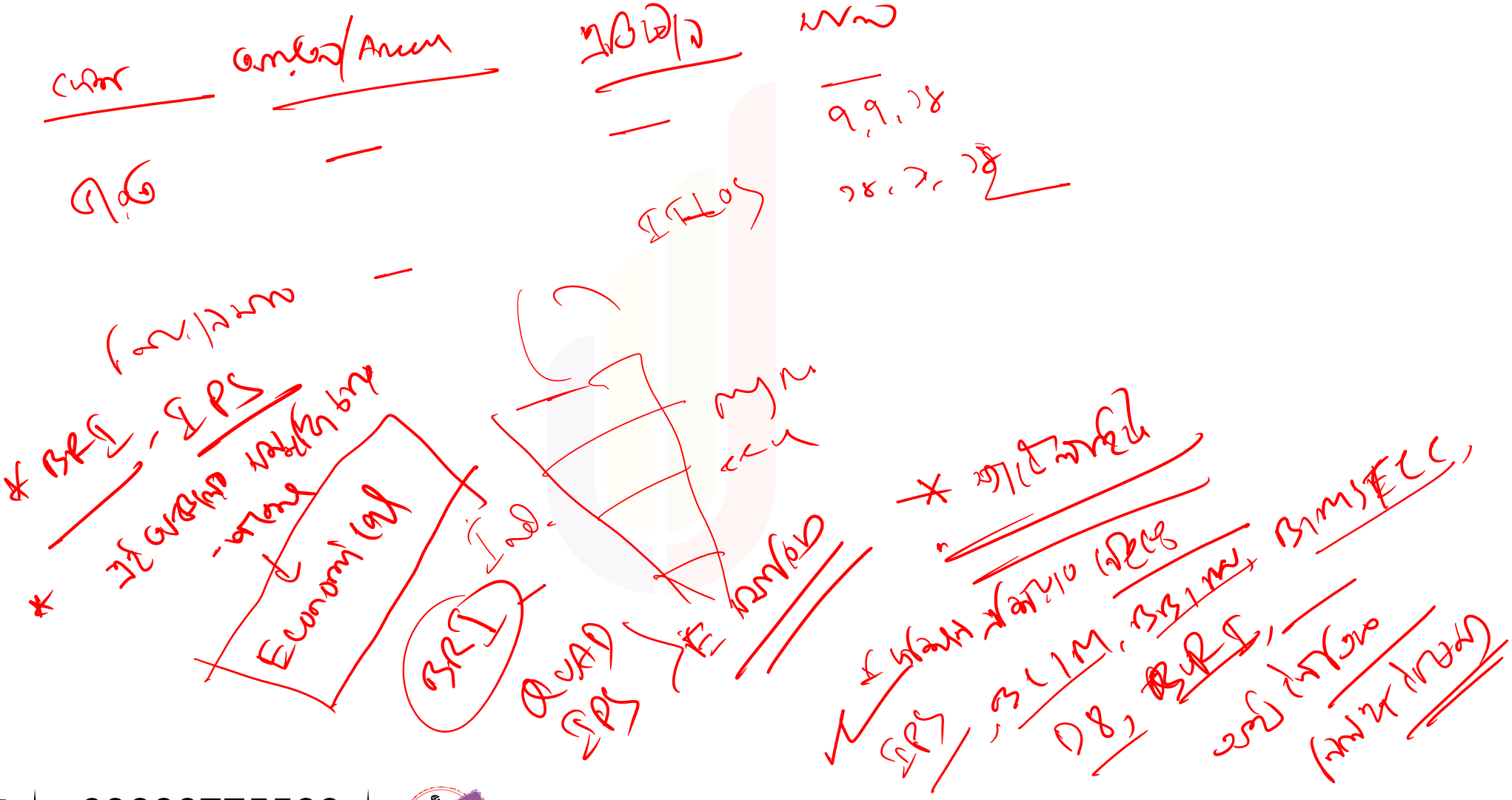

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন :** বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে। ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর ভারতের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করবে এবং ভারত বিনিময়ে বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর ছেড়ে দেবে। বাংলাদেশ সরকার ২৭ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী দ্বারা তা স্বীকৃতি দিলেও ভারত সরকার স্বীকৃতি দেয়নি। আর এই সমস্যার সমাধান হয় ১ আগস্ট, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় চুক্তি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে ভারতের ছিটমহল ছিল ১১১টি আর ভারতে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল ৫১টি। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশ ১৭,০০০ একর জমি লাভ করে আর ভারত পায় ৭,৫০০ একর জমি। বর্তমানে ৬.৫ কি, মি. জমির সীমানা এখনো অচিহ্নিত রয়েছে। ছিটমহল বিনিময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অন্যতম বড় একটি অর্জনও বলা যায়।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ :** বাংলাদেশ ২০০৭ সালে প্রথম স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ শুরু করে। বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের অকল্যান্ডের কেনেডি স্পেস সেন্টারের কেপ কেনাভেরাল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় (স্থানীয় সময় ১১ মে, ২০১৮; বাংলাদেশ সময় ১২ মে, ২০১৮; ভোর ২ : ১৪ মিনিট)। এটি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে ১৯ মে, ২০১৯। স্যাটেলাইটটির মেয়াদকাল ১৫ বছর (স্থায়ীত্ব প্রায় ১৮ বছর)। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ৯ নভেম্বর, ২০১৮। বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থেলেস এলেনিয়া স্পেস। স্যাটেলাইটটি নির্মিত হয় ফ্রান্সের কান টুলুজ ফ্যাসিলিতে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মোট ট্রান্সপন্ডার ৪০টি এবং ওজন ৩.৭ টন। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি বহনকারী রকেট ফ্যালকুন-৯। গাজীপুরের জয়দেবপুর এবং রাঙামাটির বেতবুনিয়া উপগ্রহ কেন্দ্রে এই স্যাটেলাইটের দুইটি গ্রাউন্ড স্টেশন রয়েছে। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের আগে তা স্থাপনের জন্য কক্ষপথ বা অরবিটাল স্লট ক্রয় করেছিল ২০১৩ সালে রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে। এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ তাঁর সরব উপস্থিতি প্রমাণ করলো। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ২য় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনে চুক্তি সম্পাদন করেছে।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ :** বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে ১২ মার্চ, ২০১৭ সালে। ৪১তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ 'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা' নামে দুইটি মিং ক্লাস সাবমেরিন নৌবাহিনীতে যুক্ত করার মধ্যদিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে নিজের নাম লেখাতে সক্ষম হয়। তবে বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক SEA ME-WE-4 এ যুক্ত হয় ২১ মে, ২০০৬ সালে। বাংলাদেশে SEA-ME-WE-4 এর ল্যান্ডিং স্টেশন রয়েছে কক্সবাজারের ঝিলংমে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এ যুক্ত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে। দ্বিতীয় সাবমেরিন এর দৈর্ঘ্য ২০,০০০ কি.মি. এবং এর ল্যান্ডিং স্টেশন অবস্থিত পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়। সাবমেরিন যুগে প্রবেশের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ নতুন মাত্রা যোগ করলো।
- **MDG (Millennium Development Goals) অর্জনে সাফল্য :** ২০০০ সালে ঘোষিত MDG তে ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজির ৮টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৮টি উদ্দেশ্য পূরণে জাতিসংঘের ১৮৯টি সদস্য দেশ একমত হয়। MDG গৃহীত হয় ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০; মেয়াদকাল ছিল ২০০১ থেকে ২০১৫। তাই মেয়াদকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে। এটি জাতিসংঘের ৫৫তম অধিবেশনে গৃহীত হয়। লক্ষ্যগুলো অর্জনে ইতোমধ্যে ৯টি সূচক অর্জন করেছে বাংলাদেশ আরও ১০টি সূচকে অর্জন লক্ষ্য মাত্রার কাছাকাছি অবস্থান করছে। MDG অর্জনে সাফল্য লাভের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- দারিদ্র্যের ব্যবধান অনুপাত ২০১৫ সালে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তারপূর্বেই বাংলাদেশ তা ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

- শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য এমডিজি-৪ অর্জনে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশকে ইউনিসেফ কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রার MDG-২ এর ক্ষেত্রে ২০১১ সালের মধ্যেই ৯৫ শতাংশ শিশুকে প্রাইমারী স্কুলে পাঠানোর লক্ষ্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

- বাংলাদেশ মানব সূচক উন্নয়নে ০.৫২৪ সূচক অর্জন করে ১৭৯টি দেশের মধ্যে ১৩৯তম স্থান অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির রোল মডেল। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতা অর্জন এবং স্বাস্থ্য খাতে গুণগত মান উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করায় আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন, সাউথ সাউথ নিউজ ও জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে **সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড** প্রদান করে।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **জাতিসংঘে বাংলাদেশ :** ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে জাতিসংঘের (২৯তম সাধারণ অধিবেশনে) সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য পদ লাভের পর ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতিসংঘে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয় ১৯৮৬ সালে (৪১তম অধিবেশনে)। এই অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে ২ বার। ১ম বার নির্বাচিত হয় ১০ নভেম্বর, ১৯৭৮ সালে (১৯৭৯-১৯৮০ মেয়াদে) এবং ২য় বার নির্বাচিত হয় ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে (২০০০-২০০১ মেয়াদে)। এছাড়াও বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পদ লাভ করে ২০০১ সালে। এই মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন সৈয়দ আনোয়ারুল করিম (এস এ করিম) এবং বর্তমানে স্থায়ী প্রতিনিধি হলেন রাবাব ফাতেমা (১৪তম স্থায়ী প্রতিনিধি, দ্বিতীয় নারী প্রতিনিধি)। জাতিসংঘে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে আন্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন আমিরাহ হক এবং প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্থায়ী সালিশি আদালতের বিচারক হন বিচারপতি মোঃ তফাজ্জল ইসলাম ও বিচারপতি আওলাদ আলী। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ০.০১ শতাংশ। জাতিসংঘে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাংলায় ভাষণ দেন শেখ হাসিনা।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ :** ১৯৪৮ সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ ইরাক-ইরান সামরিক পর্যবেক্ষণ গ্রুপ (UNIIMOG) অপারেশনে যোগদানের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশ নেয়। জাতিসংঘ শান্তিমিশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কর্মরত আছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার শান্তি মিশনে (UNTAG) বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম অংশ নেয়। ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় শহিদ হন। শেরে বাংলানগরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নিহতদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এসপি মিলি বিশ্বাস প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মোট ৪৩টি দেশে ৬৩টি শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১৩টি দেশে ১৩টি শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ৬০৯২ জন সশস্ত্র বাহিনী কর্মরত আছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। শান্তিরক্ষা মিশন এখন বাংলাদেশের জাতীয় কূটনীতি ও আয়ের অংশ।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

➢ **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেতৃত্ব :** বাংলাদেশ বর্তমানে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। যেমন:

➲ **One Health Global Leaders Group Antimicrobial Resistance-এর কো চেয়ারম্যান :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা WHO, FAO ও OIF কর্তৃক ২০২১-২০২২ (দুই বছর) সালের জন্য One Health Global Leaders Group Antimicrobial Resistance-এর কো-চেয়ারম্যান মনোনীত হন।

➲ **বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিন সংস্থার সদস্য নির্বাচিত :** সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিনটি অঙ্গ সংস্থা UNDP, UNFPA ও UNOPS নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয় (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০)। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি (২০২১-২৩) মেয়াদে বাংলাদেশ নির্বাহী বোর্ডের সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

➲ **জাতিসংঘের WSIS পুরস্কার লাভ :** তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'World Summit on Information Society' পুরস্কার, ২০২০ লাভ করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC)।

# বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **CFC এর এমডি পদে বাংলাদেশ :** জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় পরিচালিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট দ্য কমন ফান্ড ফর কমডিটিজের (CFC) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে জয়লাভ করে বাংলাদেশ। ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ সুইজারল্যান্ডের হেগে CFC এর গভর্নিং কাউন্সিলের ৩১তম বার্ষিক সভায় নেদারল্যান্ডসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শেখ মুহম্মদ বেলাল আগামী চার বছরের জন্য CFC এর এমডি পদে নির্বাচিত হন।
- **প্রধানমন্ত্রীর দুই পদক লাভ :** জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে যোগদান সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মর্যাদাসম্পন্ন দুইটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। যথা:
  ১. বাংলাদেশের শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্যের জন্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জি-এভিআই) কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো-২০১৯' সম্মাননা।
  ২. বাংলাদেশের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ পুরস্কার ২০১৯।
- **মেডেল অব ডিসটিংকশন :** দরিদ্র, অসহায়, বিশেষ করে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশ্রয়দান ও বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২৮ মার্চ, ২০১৮ 'মেডেল অব ডিসটিংকশন' সম্মানে ভূষিত করেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল।

# বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদেরকে বহির্বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয়। ফলে আমাদের যত অর্জন ঠিক তেমনি তত বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। নিচে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হলো :

- করোনা ও অর্থনীতি
- করোনা ও জনশক্তি রপ্তানি
- বেকারত্ব
- LDC উন্নয়ন
- Blue Economy
- অভিন্ন নদীর পানিবন্টন
- মিয়ানমার ইস্যু
- অভ্যন্তরীন সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতা
- রপ্তানি আয় কাঙ্ক্ষিত হারে না বাড়া
- রিজার্ভ কমে যাওয়া
- রেমিটেন্স ও হুন্ডি

# বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। তাই এ দেশকে অবজ্ঞা করে বিশ্ব সম্প্রদায়ও ভালাভাবে চলতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বদরবার থেকে আমরা যদি আমাদের স্বার্থ আদায় করতে না পারি তবে আমাদের দেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ হতে পারে নিম্নরূপ:

- করোনা মহামারি মোকাবিলা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ। আর তাই টিকা প্রাপ্তি এখন একমাত্র পন্থা। কীভাবে বিভিন্ন দেশ হতে টিকা আমদানি করা যায় এবং দেশে কীভাবে টিকা উৎপাদন করা সম্ভব এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। টিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য।
- মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলায় জয় লাভের ফলে বাংলাদেশ এখন ব্যাপক সমুদ্র অঞ্চলের মালিক। ফলে সুনীল অর্থনীতি তথা সমুদ্র অর্থনীতির দুয়ার খুলে গেছে। এই বিশাল সম্পদকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এবং সম্পদ আহরণে কীভাবে দক্ষতা বাড়ানো যায় সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব হলে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে সম্ভব হবে। তাই সমুদ্র অর্থনীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

# বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের দেশও বলা হয়েছে। এদেশে তেল-গ্যাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই এই প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে উত্তোলন ও ব্যবহার উপযোগী করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের জন্য ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এটা একটা বৃহত্তম প্রকল্প, তাই প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সচল থাকতে পারে সেই জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা যাতে এই প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে সেই উদ্দেশ্য ও ভাবনাকে মাথায় রেখে অগ্রসর হতে হবে।
- বাংলাদেশ-ভারত তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে অনেক নাটক হয়ে গেল, কিন্তু কোনো সুরাহা মিললো না। তাই বাংলাদেশ চীনের সহযোগিতায় তিস্তা মহাপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে আসবে ভারত। তাই এই পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। কী ধরনের বাঁধা আসতে পারে তা আগেই পরিকল্পনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

# বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলের দেশ হওয়ায়, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শিকার দেশে পরিণত হচ্ছে। তাই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী ধরনের পরিকল্পন গ্রহণ করা প্রয়োজন তা অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করে অগ্রসর হতে হবে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর দেওয়া ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভুটানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যৎ চীন-ভারতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ বলা হয় রেমিট্যান্সকে। আর এই রেমিট্যান্স প্রবাহ সচল রাখতে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য একটি অপরিহার্য কাজ। কিন্তু বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানিতে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। তাই জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে আরো বেশি তৎপর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- আমাদের তিন পাশে ভারত অবস্থিত হলেও তারাও নানাভাবে আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কারণ ভারতের চতুর্দিকে রয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চীন, মিয়ানমার। ফলে আমরা যদি অন্য রাষ্ট্রগুলোর মতো ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠি তা কারোর জন্যই ভালো হবে না। তাই ভারতের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে আমাদের স্বার্থগুলো বুঝে নিতে হবে।

# বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- বর্তমান বিশ্বে জঙ্গিবাদ একটি ভয়ানক শব্দ। তাই কোনো জঙ্গিবাদী সংগঠন যেন আমাদের দেশে শাখা-উপশাখার মতো প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।
- সমুদ্রসীমা যেমন আমরা আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করেছি তেমনি অন্যান্য যে সব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে সেগুলোও আমাদের আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করে আনতে হবে।
- প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে আমাদের দেশের নিরাপত্তা, শান্তি যেন বিঘ্ন ঘটতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থেকে ভবিষ্যতে যেন কোনো অপশক্তি বাংলাদেশে আঘাত হেনে এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি এ দেশের ভাবমূর্তি যেন বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল হয় সে ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বদরবার যদি বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মূল্যায়ন না করে তবে এই দেশ কোনোদিন উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারবে না। ফলে এটিই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

# বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- শিক্ষাক্ষেত্রে যে দেশ বেশি উন্নত সে দেশ সার্বিকভাবে তত বেশি উন্নত। তাই বলা চলে যে, আমাদের দেশের অনগ্রসরতার সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে না পারলে এই দেশ কখনও কাম্য মাত্রায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকায় আসীন হতে পারবে না। এছাড়া আরও একটি সমস্যা হলো শিক্ষাজীবন শেষ করার পর এদেশের অধিকাংশ জনগণকে বেকারত্বের বোঝা বহন করতে হয়। ফলে বেকারত্ব দূর করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এ অভিশপ্ত বেকারত্ব দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে বাংলাদেশ যেমন বিশ্বমানচিত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে ঠিক তেমনি ক্ষুধা, চরম দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, নানা প্রকারের রোগব্যাধির কারণে বাংলাদেশ একটি সমস্যার জালে আবদ্ধ রয়েছে। তাই অর্জনের সাথে সাথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে ভবিষ্যতে আরও কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য করণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে অনেকদূর এগিয়ে নিতে সরকারের সাথে সাথে সকল বেসরকারি সংস্থা (NGO), পেশাজীবী সর্বোপরি সকল শ্রেণির মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান মূলনীতিটি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি সদ্য জন্ম নেওয়া স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বলেছিলেন যে, "আমাদের দেশটি ক্ষুদ্র, তাই কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, আমরা চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব।" তাঁর এই উক্তির মধ্যেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। এ ছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য। তাই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতিসমূহও মেনে চলে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিকগুলো হলো:

## ❑ সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে কোনো একটির পক্ষাবলম্বন করে অন্যটির বিরাগভাজন হতে চায় না। এর চেয়েও বড় কথা হলো যে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ চায় না যে, সে কোনো বৃহৎ শক্তির গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাই বাংলাদেশ কোনো নির্দিষ্ট বলয়ে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে।

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

❑ **আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন:**

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

* G3 — F T E M T N

* সংবিধানের 25 নং অনু----

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

## ➢ সম্মান প্রদর্শন

বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। এই মূলনীতিটি জাতিসংঘ সনদের ২(৪) অনুচ্ছেদের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

## ➢ হস্তক্ষেপ না করা

অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার মূলনীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মূলনীতিটিও জাতিসংঘ সনদের ২(৭) অনুচ্ছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

## ➢ বিশ্ব শান্তি

বাংলাদেশ যে বিশ্ব শান্তি কামনা করে, তা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে দেখতে চাই।" বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত শান্তির এই মূলনীতির কয়েকটি তাৎপর্য নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে।
- বাংলাদেশ যেকোনো বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পক্ষপাতি এবং
- বাংলাদেশ চায়, যেকোনো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও সবসময় মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ কখনও বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি প্রদর্শন না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

## ➢ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি

একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর তাকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রধানত, তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। নয় মাসের যুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি এবং উৎপাদনের কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর গভীরভাবে অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। একই সাথে পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীরা সে সময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। সুতরাং এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে বাংলাদেশ যাতে তার মর্যাদা বজায় রেখে বহির্বিশ্বে একটি মর্যাদাকর ভাবমূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে, যা এখনও অনুসৃত হয়ে আসছে।

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

## ➢ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো এর জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। জাতীয় সম্পদের অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জন্য তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে তার সমুদ্রের তলদেশ ও অভ্যন্তরীণ জলসীমার মধ্যে অবস্থিত সম্পদসহ অন্য যেকোনো সম্পদের উপর যেকোনো রকম বৈদেশিক দখলদারিত্বের চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়। এভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব থাকে এর জাতীয় সম্পদগুলোকে সংরক্ষণ এবং সময় ও সুযোগ বুঝে এগুলোকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো।

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

## ➢ অর্থনৈতিক অগ্রগতি

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, কিন্তু এর মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা যদি যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো যায়, তবে তা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সক্ষম হবে। বিশেষত বাংলাদেশের যে বিশাল মানব সম্পদ রয়েছে তাদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে সারা বিশ্বে প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে। আবার সহজ শর্তে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে তা দিয়ে এই বিপুল মানব সম্পদকে দেশেই যথার্থ উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়ে দেশের উৎপাদন বাড়ানো এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও সামনে রাখা হয়।

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

## ➢ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের জন্যও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টি পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা বলতে সাধারণত বোঝায় তার সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে নাগরিকদের জান মাল রক্ষা করা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি বহুবার বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি এসেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এমনভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে যাতে বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ একটি আত্মরক্ষায় সক্ষম সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দেশের ভাবমূর্তি অর্জন করতে পারে। এছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও প্রয়োজনে নিজেদের শক্তির মহড়া দেওয়া পররাষ্ট্রনীতিতে নিরাপত্তার খাতিরেই সংযোজিত হয়।

## ➢ নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা

বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই কোনো না কোনো মতবাদ অনুসরণ করে অথবা প্রচলিত যেকোনো মতবাদের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের লক্ষ্য থাকে যেন ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক এ দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের কোনোটিই পুরোপুরিভাবে অনুসরণ না করা হয়। বরং দুইটি পদ্ধতির ভালো দিকগুলো নিয়ে একটি মিশ্র অর্থনীতিকে অনুসরণ করে থাকে।

# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

- ভৌগোলিক-কৌশলগত অবস্থান
- জনসংখ্যা
- জনমত ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
- অর্থনৈতিক অগ্রগতি
- রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতাদর্শ
- সামরিক সামর্থ্য
- প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ

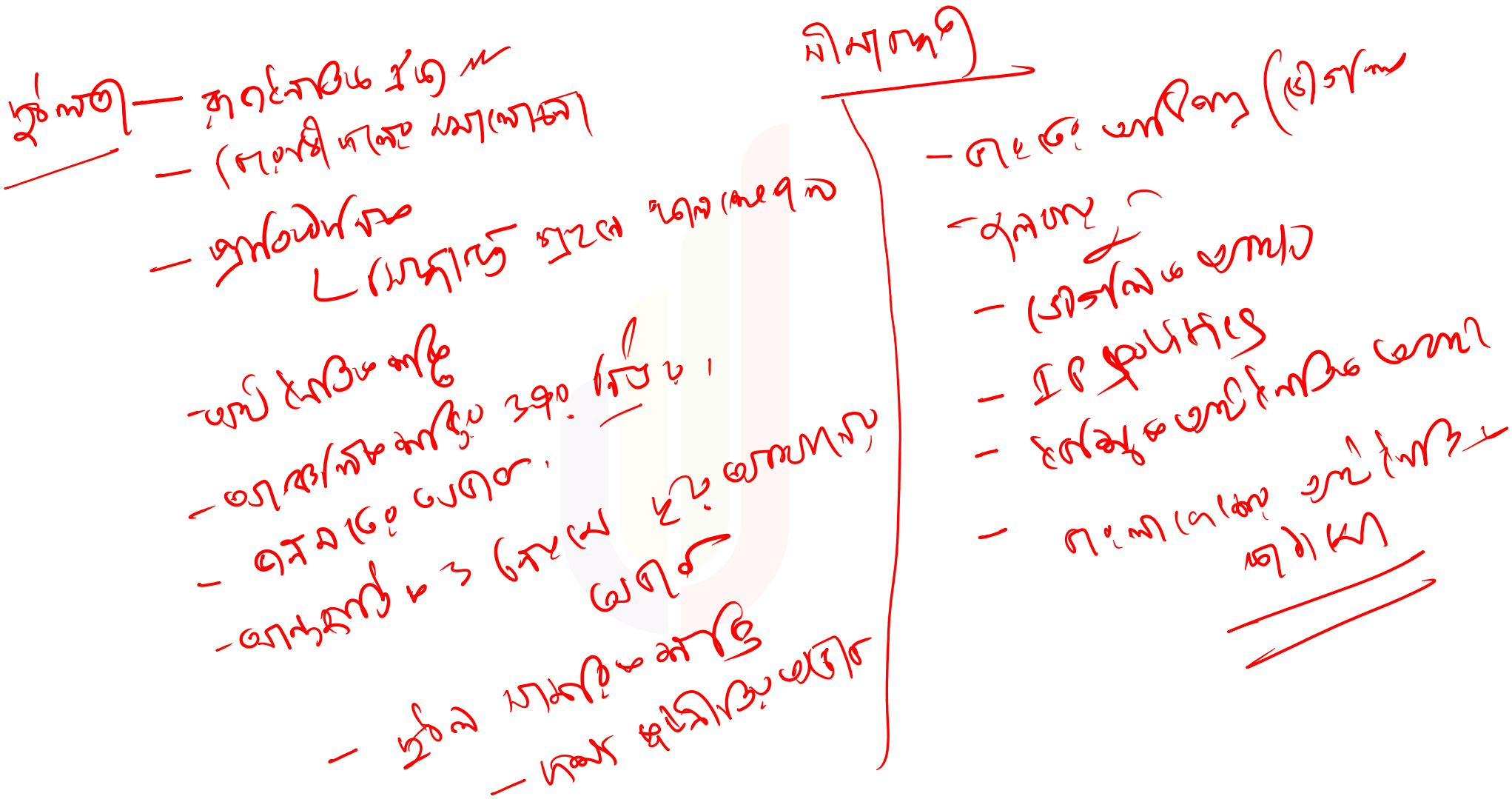

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

## ❖ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুনীল অর্থনীতির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের মালিক। আর এই নীল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিচিত্র সামুদ্রিক সম্পদ। তেল, গ্যাস, মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম, মোনাজাইট, জিরকন, শামুক, ঝিনুক, মাছ, অক্টোপাস, হাঙ্গর ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণিজ ও খনিজসম্পদ রয়েছে সাগরে। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে মৎস্য সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। এখানে প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। আরও রয়েছে ২০ প্রজাতির কাঁকড়া, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৩০০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক। এছাড়াও রয়েছে টুনা মাছের মতো দামি ও সুস্বাদু মাছ, যার রয়েছে প্রচুর আন্তর্জাতিক চাহিদা। 'সেভ আওয়ার সি'-এর তথ্যমতে, সমুদ্র থেকে শুধু মাছ রফতানি করে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা সম্ভব।

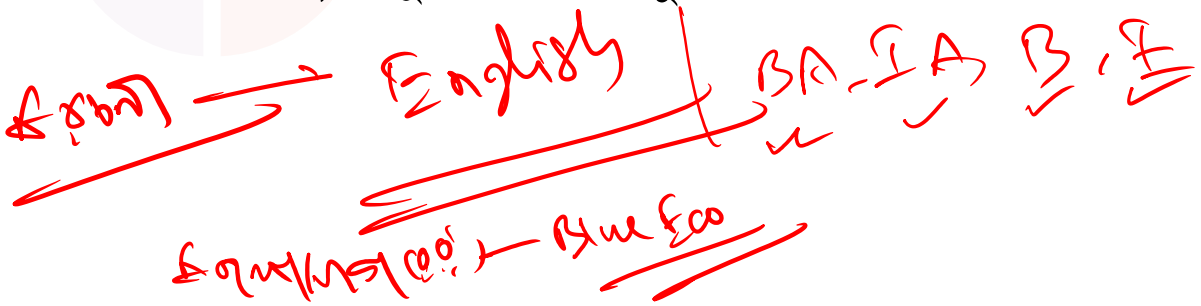

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর মতে, ২০২২ সালের মধ্যে যে চারটি দেশ মৎস্য সম্পদে বিপুল পরিমাণ সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। ২০১৭-২০ সালে সারা দেশে মোট উৎপাদিত মাছের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ ছিল ৬০ লাখ মেট্রিক টন; যদিও ৮০ লাখ টন মাছ ধরার সুযোগ রয়েছে। ৬০০ কিলোমিটার সমুদ্রসীমার মধ্যে মাছ ধরার সীমানা মাত্র ৩৭০ কিলোমিটার। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তির অভাবে এ দেশের জেলেরা মাত্র ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত মাছ ধরতে পারে। ফলে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ থাকার পরও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কাজে লাগাতে হবে।

সমুদ্রকে ঘিরে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। যা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, শিল্প উন্নয়ন, টেকসই ও পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

## ❖ সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯০ ভাগ পরিবহন হয় সমুদ্র পথে। সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের ফলে আমদানি রপ্তানির খরচ অনেক কমে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের মতে সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগাতে পারলে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। তবে দেশে এখন পর্যন্ত সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। গত আট বছরে গভীর-অগভীর সমুদ্রসম্পদ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে মিয়ানমার, ভারত সমুদ্রের তেল-গ্যাস উত্তোলন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এ দেশে সীমিত পরিসরে তেল-গ্যাস আহরণ শুরু হয়েছে যা বঙ্গোপসাগরে অফুরন্ত তেল-গ্যাস ভাণ্ডারের তুলনায় খুবই স্বল্প। পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। এতেই ঘুরে দাঁড়াবে অর্থনীতি।

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

➲ **শিপিং শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** শিপিং বিশ্ব বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন উপকূলীয় জাহাজ, লাইটার, ট্যাংকার ইত্যাদির ভাড়া ও পরিবহন ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশের অনেক আয় করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিলিয়ন ডলার শিল্প হল নৌ-যান নির্মাণ শিল্প। এ সুযোগ লুফে নিয়ে সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেশীয় জাহাজ বহর সমৃদ্ধ করতে পারলে রাজস্বে মোটা অংকের আয় যুক্ত করা সম্ভব। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ নীল জলরাশির সম্পদে অগ্রাধিকার দেয়ার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, যাতে গুরুত্ব পাবে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে, পরিকল্পিতভাবে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করতে হবে, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাহায্য নিতে হবে; যদিও ইতোমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে, তবে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে তৎপর হতে হবে।

➲ **সমুদ্রবন্দর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সিঙ্গাপুরের প্রধান আয়ের উৎস সমুদ্রবন্দর। বাংলাদেশে ৩টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে যা বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর করার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক এগিয়ে যাবে।

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

- **জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা:** জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প দেশের শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প দেশের বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ এ খাত থেকে অনেক লাভবান হতে পারে। উল্লেখ্য, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

- **খাদ্যের উৎস হিসেবে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** সমুদ্র বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণের অন্যতম উৎস। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সমুদ্র থেকে ৬.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করা হয়েছে। ইলিশ মাছ বিশ্বের ৮০% উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। এছাড়াও বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ও কোরাল দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও বিদেশে রপ্তানিতে ভূমিকা রাখে।

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

- **তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা :** সমুদ্র তলদেশ থেকে আহরিত তেল-গ্যাস বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে একটি সামুদ্রিক কূপ 'সাঙ্গু" থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। আরও কয়েকটি গ্যাস খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন- কুতুবদিয়া, হাতিয়া, ম্যাগনামা ইত্যাদি। এসব খনি থেকে গ্যাস উত্তোলন খুব শীঘ্র শুরু হবে। আরও তেল-গ্যাস কূপ অনুসন্ধানের জন্য বাপেক্সসহ কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি কাজ করে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্র তলদেশে ২০০ Tcf গ্যাসের মজুদ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগাতে পারলে ১২ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব যদিও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বঙ্গোপসাগরে অফুরন্ত তেল ও গ্যাস ভাণ্ডার রয়েছে। যদি বঙ্গোপসাগরের এই সম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় তাহলে বাড়বে রাজস্ব, ঘুরে দাঁড়াবে অর্থনীতি। আর এভাবেই ২০৩০ সালের মধ্যে SDG লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন-২০৪১ অর্জন সম্ভব হবে।
- **লবণ শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব :** লবণের প্রধান উৎস সমুদ্র। বর্তমানে উপকূলবর্তী এলাকা থেকে উৎপাদিত লবণ দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও বেশি লবণ উৎপাদন সম্ভব হলে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

- **নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম উৎস সমুদ্র। সমুদ্র বায়ু, স্রোত, ঢেউ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন করা সম্ভব।
- **পর্যটন ও বিনোদন শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** সমুদ্র দ্বীপ ও সমুদ্র উপকূল পর্যটনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় স্থান। বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন: মালদ্বীপ, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশের আয়ের অন্যতম উৎস পর্যটন শিল্প। বাংলাদেশের কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, অন্যান্য দ্বীপ ও পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। এছাড়া প্রমোদতরী ভ্রমণ ও বিভিন্ন সমুদ্র ভিত্তিক খেলা ও বিনোদন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে।
- **মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা:** সুনীল অর্থনীতি বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নয়টি গবেষণা পরিচালনা করছে। এর মধ্যে সমুদ্র উপকূলে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, শিলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও ওয়েস্টার চাষ, হরিণা ও চাকা চিংড়ির চাষ, খাঁচায় ভেটকি ও মুলেটের চাষ, গ্রিন মাসলের চাষ ইত্যাদি অন্যতম। কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে এ পর্যন্ত ১৩৮ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ প্রজাতির শৈবাল বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানিযোগ্য ও লাভজনক।

# বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

➲ **টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** ব্লু ইকোনমি বাংলাদেশের মতো সমুদ্রভিত্তিক দেশের টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যতের প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের ক্ষমতাকে আপস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে। টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নীল অর্থনীতি হলো সমুদ্র এবং তার সংস্থানসমূহের ব্যবহার এবং ধারণাটি বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন। দেশের স্থলভাগে যে পরিমাণ সম্পদ আছে তার প্রায় সমপরিমাণ (৮১ শতাংশ) সম্পদ সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে যে সম্পদ রয়েছে তা টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তেল-গ্যাসসহ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ উত্তোলন, মৎস্যসম্পদ আহরণ, বন্দরের সুবিধা সম্প্রসারণ ও পর্যটনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতিবছর আড়াই লাখ কোটি ডলার আয় করা সম্ভব। অপার সম্ভাবনাময় এ খাতকে কাজে লাগানো জরুরি। সমুদ্রের তলদেশে কী ধরনের সম্পদ রয়েছে, সেগুলো আহরণ করতে হলে কোন ধরনের প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ জনবল প্রয়োজন তা পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশ। দেশের স্থলভাগের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্রসীমায় এখন মূল্যবান সম্পদের ভাণ্ডার। ভারত ও মিয়ানমার থেকে অর্জিত সমুদ্রসীমায় ২৬টি ব্লক রয়েছে। ইজারা দিয়ে এসব ব্লক থেকে প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া সম্ভব মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া নীল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিচিত্র সামুদ্রিক সম্পদ।

# LDC

## ❑ ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ECOSOC ১৯৬৪ সালে UNCTAD গঠন করে। ১৯৬৪ সালেই UNCTAD আবার G-77 গ্রুপ গঠন করে যার সদস্যগুলো মূলত উন্নয়নশীল ৭৭টি দেশ। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ G-77 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে LDC তালিকাভুক্ত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ LDC ভুক্ত হয়।

## ❑ LDC থেকে উত্তরণ

১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে CDP তাদের ২০তম সভায় ঘোষণা করে যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে এর চূড়ান্ত ঘোষণা পেতে হলে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং পরপর ৩ ধাপে উত্তরণের শর্ত গুলো ধরে রাখতে হবে।

## ❑ LDC থেকে উত্তরণের শর্ত:

| সূচক/LDC থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত | CDP শর্ত | বাংলাদেশের অর্জন | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৮ | ২০২১ |
| গড় মাথাপিছু আয় (GNI) | ১২৩০ ডলারের বেশি<br>(২০২১ সালে নতুন মানদণ্ড ১২২২ ডলারের বেশি) | ১২৭৪ ডলার | ১৮২৭ ডলার |
| মানব সম্পদ সূচক (HAI) | ৬৬ বা তার বেশি | ৭৫.২ | ৭৫.৩ |
| অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI) | ৩২ বা তার কম | ২৫.২ | ২৭.২ |

বাংলাদেশ LDC থেকে উত্তরণের প্রথমবার শর্ত পূরণ করে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘের CDP ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারণ করে যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) বিভাগ থেকে স্নাতক হওয়ার জন্য ৩টি প্রয়োজনীয় শর্ত আবারো পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। একটি দেশকে LDC উত্তরণের জন্য পরপর ৩বার শর্ত পূরণের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। বাংলাদেশ ২০১৮, ২০২১ পরপর দুইবার সক্ষম হয়েছে। ২০২৪ সালে ৩য় বার সফল হতে হবে। যার ফলে ২০২৬ সালে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাবে এবং ২০২৭ সাল থেকে LDC ভুক্ত দেশের সকল সুবিধা বাংলাদেশ হারাবে।

তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের শক্তিশালী পারফরম্যান্স তার অর্থনৈতিক শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে। এমনকি COVID-19 মহামারির সময়েও বাংলাদেশ সবগুলো শর্ত পূরণে সক্ষম ছিল। ফলস্বরুপ, দেশটি ২০২৬ সালের নভেম্বরে LDC মর্যাদা থেকে উন্নয়নশীল দেশ হতে চলেছে।

## ❑ চ্যালেঞ্জসমূহ

নভেম্বর, ২০২৬ বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পন করলে অনেকগুলো সুবিধা হারাবে এবং কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে —

- ✓ GSP সুবিধা, কোটা সুবিধা ও শুল্ক সুবিধা হারানোর ফলে বাংলাদেশ তার বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১৪% বা ৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার হারাতে পারে।
- ✓ পোশাক খাতের বাজার একসেস (Access) হারানোর ফলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে পোশাক রপ্তানি ৮-১০% কমে যাবে।
- ✓ LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে LDC নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাগুলো বা ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য যোগ্য হবে না।
- ✓ ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আর Soft Loan বা স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে না। ঋণের জন্য বাংলাদেশকে কমপক্ষে ২.২৬% সুদে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

# LDC

- ✓ বাংলাদেশ Green Climate Fund এর মতো বিশেষ তহবিল হতে অর্থ পাবে না। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাবে। যেহেতু বাংলাদেশ জলবায়ু বিপর্যয়ের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সুতরাং GCF হারানো একটি বড় ধাক্কা হতে পারে।
- ✓ জাতিসংঘের প্রযুক্তি ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সহায়তা দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে তারা বাংলাদেশকে আর সহায়তা করবে না।
- ✓ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ খুবই কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

## ❑ LDC থেকে উত্তরণের সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি কিছু সুবিধাও পাবে—

- ✓ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরুপ, দেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সংকেত পাবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে।
- ✓ সুদের হার বাড়লেও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সহজ হবে এবং ব্যবসায়ীদের LC (Letter of Credit) নিশ্চিতকরণের খরচ বিদেশি ব্যাংকগুলি কমিয়ে দেবে।
- ✓ বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স এবং রাজস্ব আদায়ও বাড়বে।

## ❑ সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশসমূহ

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য যে সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

- ✓ আমাদের কর জিডিপি অনুপাত ৭.৫ শতাংশ যা এখনও তুলনামূলকভাবে কম। প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কর সংগ্রহকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারি।
- ✓ মানি লন্ডারিং করে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে মানি লন্ডারিং বন্ধ করা হয়েছে এবং এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- ✓ GSP সুবিধা হারানোর বিপরীতে FTA, PTA, MFN (Most favored Nation), GSP Plus সুবিধা ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ✓ FDI বাড়ানোর জন্য কূটনৈতিক মিশনগুলোকে প্রতিটি দেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে তুলে ধরতে হবে।
- ✓ যেহেতু বাংলাদেশ Copy right সুবিধা হারাবে সেহেতু Digital Economy, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

# LDC

- ✓ বাংলাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশগুলোকেও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।
- ✓ বাংলাদেশ ২০১২ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এ প্রবেশ করেছে যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই সময়ে বাংলাদেশ তার জনশক্তিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের ফলে বাংলাদেশ অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে যাবে। আর এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে প্রতিটি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। UNCTAD এর সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে স্বচ্ছতার মাধ্যমে ৮০% বাণিজ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আন্তর্জাতিক মানের পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বিদেশি ক্রেতা ধরে রাখতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশের পথযাত্রায় এগিয়ে যেতে পারে।

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে কী কী করতে হবে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি কী? আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা পালন করতে পারে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- রোহিঙ্গা ইস্যুকে আপনি কী 'জাতীয় নিরাপত্তার সংকট' না 'মানবতার সংকট' হিসেবে বিবেচনা করেন? আপনার বিবেচনায় এ সংকট মোকাবিলা করার কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দুইটি দেশের নাম কী? স্বীকৃতি প্রদানের তারিখ কত? [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

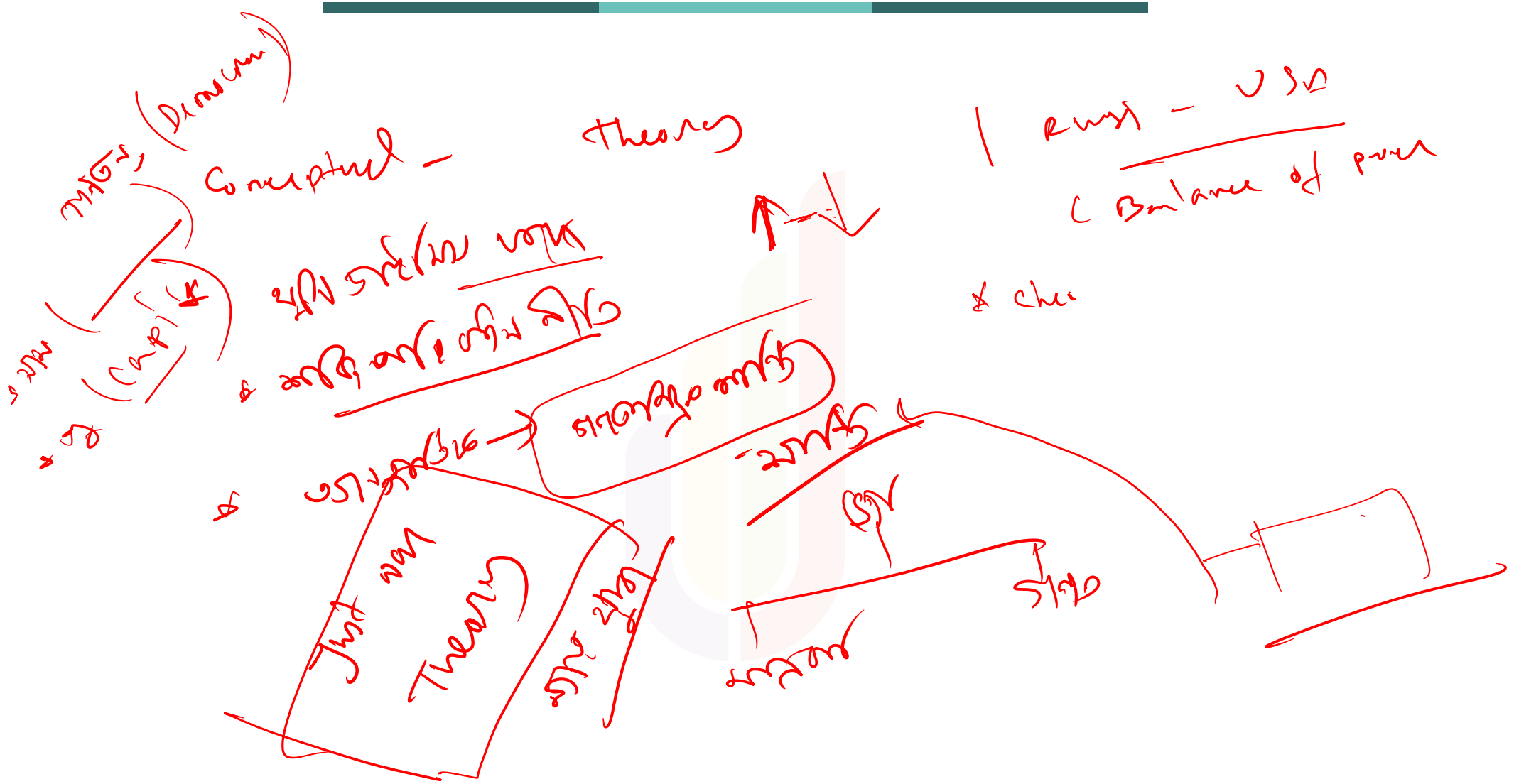

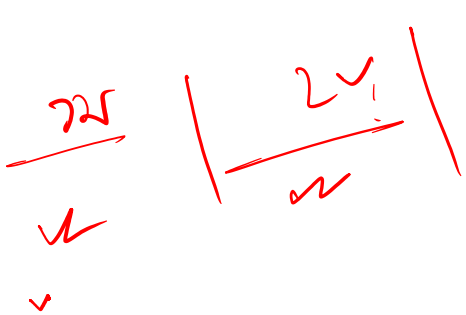

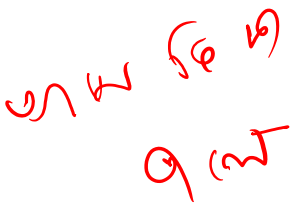

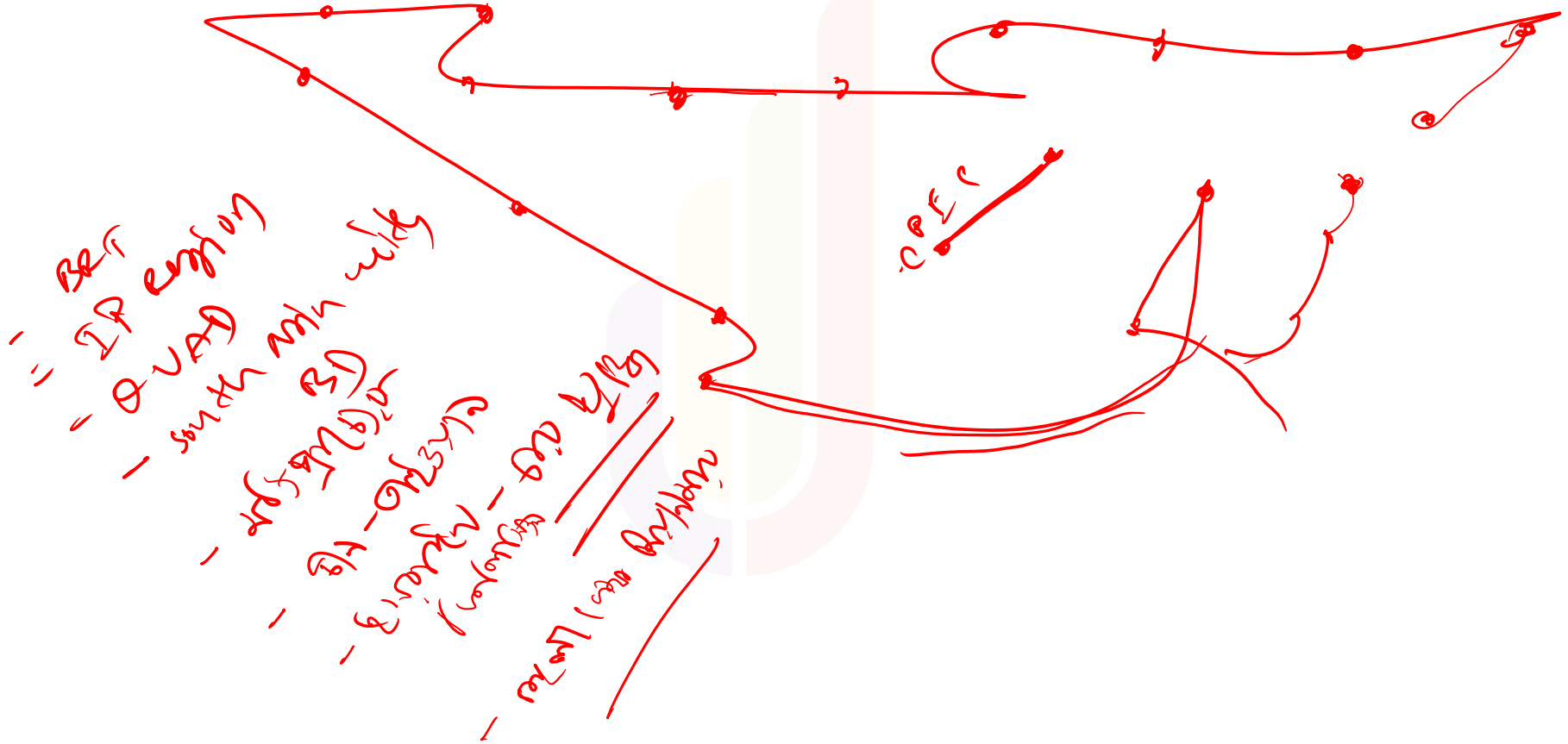

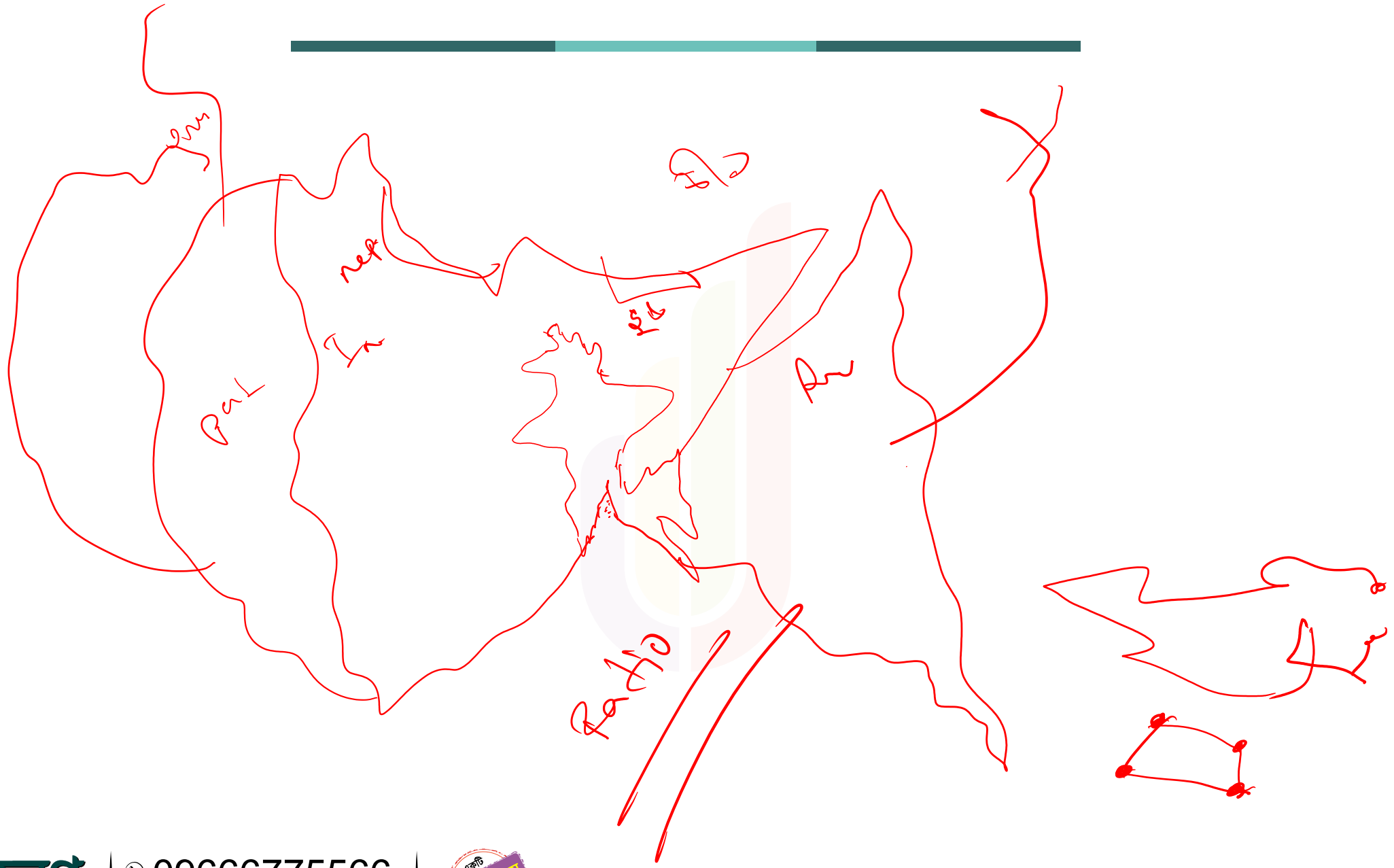

# BCS কঠিন নয়;
# প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়


Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/@/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy